# পঞ্চম অধ্যায়

## মনোজ মিত্রের নাটকে সমাজচেতনা

চতুর্থ অধ্যায়

# মনোজ মিত্রের নাটকে সমাজচেতনা

যে কোনো সার্থক শিল্পীকে, বিশেষত নাটকের রচয়িতাকে হতে হয় দায়বদ্ধ ও সমাজসচেতন। কারণ জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা নাটক স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে সমাজশোধনের দায়। মনোজ মিত্র বাংলা নাটকের এই জোরের জায়গাটিকেই মনে করেছেন এর দুর্বলতা। তাঁর মতে ঃ

> "ইহজীবনের জরুরি সমস্যা আমাদের নাটক যেমন তুলে ধরেছে, এমন আর কেউ ধরেনি। উৎপীড়ন অনাচার অবিচার ভন্ডামি চারপাশের যত শয়তানির মুখোশ ছিঁড়েছে আমাদের নাটক, অক্লান্তভাবে নির্মমভাবে ও ব্যতিক্রমহীনভাবে। আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ, আক্রমণ।"[১]

এই দায়পালনের গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি মনোজ মিত্র, কিন্তু যর্থাথ সহমর্মীর মতো উপলব্ধি করেছেন ঃ "এই বক্তব্য সর্বস্বতা, অহর্নিশি দায়িত্ব পালন বাংলা নাটককে ক্রমশ ক্লান্ত বৈচিত্র্যহীন অস্বাভাবিক করে তুলেছে। যে বিষয়কৌলীন্য ছিলো গর্বের, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘাড়ের বোঝা।"[২] বিষয়ের গুরুত্বকে কিছুমাত্র তরল না করেও মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে এই বোঝাকে লঘু করে দেন। নাটককে শিল্পকর্ম হিসেবে সার্থক করে তোলাই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে তিনি নিজের চারপাশের সমাজটাকে বিস্মৃত হন নি। যদিচ তাঁর সমাজচেতনা কিছুটা স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য ঃ

> "কোনো শিল্পি ও সাহিত্যিক সমাজের শ্রেণী সমূহের প্রতি সচেতন থেকেও তার সংগ্রামের সীমাকে কোনো নির্দিষ্ট গন্ডীতে বেঁধে রাখতে চান না। তার মানে এই নয় যে তারা শ্রেণীসমঝোতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁরা মানুষ ও সমাজের ফাঁক-ফোকর গুলো আবিষ্কার করতে চান স্বকীয় উপলব্ধিতে, জীবনের রহস্যময় আলোছায়ার বৈচিত্র্যে তাই তাঁদের লেখায় প্রকাশ পায় এক ধরণের সহানুভূতি যা কখন বা ক্ষমারই নামান্তর। তারাশঙ্কর অথবা বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে তার উদাহরণ খুব কম নয়। মনোজ মিত্রকেও বোধ করি এই দ্বিতীয় ধারার লেখক বলে গ্রহণ করা যায়।"[৩]

কিন্তু কেবলই কি ক্ষমাপরায়ণ মনোজের লেখনী ? তাঁর নাটক পাঠে কিন্তু এর বিপরীত সত্যের পরিচয়ও মেলে। মনোজ মিত্রের নাটক সমগ্র চতুর্থ খন্ডের ভূমিকায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ

> "লোভ, বোকামি, ভন্ডামি, নষ্টামি দেখলে তাঁর (মনোজ মিত্রের) কলম তরবারির ধার পেয়ে যায়। সাধু সন্তের ভেকধরা ধর্মীয় জালিয়াতদের তিনি সহ্যই করতে পারেন না। কত যে গুঁইবাবা, মৌনীবাবা, দাড়িবাবা-র মুখোস তিনি নির্মম হাতে টেনে খুলেছেন তাঁর সারাজীবনের লেখায় তার আর ইয়ত্তা নেই। রাজনীতির ভেকধারী নেতার ছদ্মবেশে অপদার্থ-কামুক-অত্যাচারী-দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের কি কম হেনস্থা হয়েছে তাঁর হাতে। তেমনি সংসারের ছোট আঙিনায় ছোট স্বার্থ,ক্ষুদ্র কূটবুদ্ধি, ছোট ছোট নিষ্ঠুরতাকেও মেলে ধরেছেন মনোজ।"[৪]

অর্থাৎ বাংলা নাটকের মুখোস ছেঁড়ায় দায় তিনিও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কাজটি যেন

যান্ত্রিক না হয়, শিল্পরূপের আধারে সংঘটিত হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। বলার বিষয়ের পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলার ধরণটিকেও। কেবল ধরণটিতেই মজে না গেলে আবিষ্কৃত হবে ঃ

> "খোলস বা মোড়ক যারই হোক, স্বরগ্রাম যেরকমই হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয় ও প্রতিষ্ঠা, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা এবং মৃত্যুর বিকল্পে জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখানোর সংকল্প থেকে মনোজ মিত্র বিচ্যুত হন না।"[৫]

একেবারে প্রথম দিককার নাটকে মনোজ মিত্র সমাজে শোষক-শোষিতের লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে শোষিতের জয় প্রদর্শনে যথেষ্ট সিরিয়াস। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে 'নেকড়ে' (১৯৬৮) এবং 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯) নাটক দুটিকে। 'নেকড়ে' নাটকে নাট্যকার সরাসরি শোষিত মানুষের পক্ষ নিয়েছেন। ভূমিজ মানুষকে বঞ্চিত করে বহিরাগত যে শোষকেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে, এখানে তাদের প্রতি ক্ষমাহীন নাট্যকার। বহিরাগত কংসারি, শক্তি এবং ধর্ম – আক্রাম এবং গোঁসাইয়ের সাহায্যে দ্বীপের মানুষকে বঞ্চিত করে বিপুল সম্পদ জমিয়েছে। অধিকার করেছে নারীকে, কিন্তু মর্যাদা দেয় নি। সেই নারী নীহারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করেছে মানুষকে। প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে হার নিশ্চিত জেনে অবলম্বন করেছে কৌশল। একটা ভয়ের আবহ সৃষ্টি করে কংসারিকে ত্রস্ত করেছে। তার শক্তির উৎসগুলি, বুলডগ কুকুর এবং আক্রামকে হত্যা করে শোষক কংসারিকে নিঃসঙ্গ করেছে। তারপর নেমেছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। সেই সংগ্রামে শশাঙ্কর গুলিতে নীহারি পড়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। সেই ঘন্টার ইঙ্গিতে ছুটে আসে চাষীরা। তাদের গলার জয়োল্লাস। শোষকের বিরুদ্ধে জয় হয় শোষিতের। এই নাটকে মানুষকে প্রধানত শ্রেণিপরিচয়ে দেখেছেন মনোজ মিত্র। সমাজে ধনের অসম বন্টন এবং মাত্রাহীন শোষণের ফলে ভূমিলগ্ন মানুষ কিভাবে নির্যাতিত হয় তা দেখিয়ে সংঘশক্তির জাগরণের মাধ্যমে সেই শোষণ পীড়ন থেকে মুক্তির পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের থিমও মোটামুটি একই। অঘোর ঘোষ এবং শঙ্কর এখানে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি আর মাতলা শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। 'নেকড়ে'তে ছিল নারী নীহারি আর এখানে নারী বাদামী ও দাক্ষায়ণী। নারীর ওপর শোষকের পীড়নের ফল দাক্ষায়ণী। বাদামী অঘোর ঘোষ কর্তৃক অধিকৃত হলে তার পরিণতিও হবে দাক্ষায়ণীর মতোই। কংসারির মতোই অঘোর ঘোষ শোষণ করেছে অনেক মানুষকে। মাতলা অঘোর ঘোষের অত্যাচারে, নিজের জীবনের জ্বালায় অত্যাচারীর প্রতি কঠোর হয়ে তার মৃত্যু কামনা করেছিল। তাই সাপে কাটা অঘোর ঘোষকে সে ঝাড়াতে চায় নি। সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধস্পৃহা জেগেছিল তার মনে। কিন্তু মানুষ তো মৃত্যুকে সরিয়ে জীবনেরই উচ্চারণকে তীব্র করে। মাতলার মধ্যে তাই প্রাণের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, মানবিকতার জাগরণ ঘটে। কিন্তু শোষক অত্যাচারী অঘোরকে লেখক মানুষ করেন নি। তাই প্রাণ ফিরে পেয়েই অঘোর লোভের হাত বাড়িয়েছে বাদামীর দিকে। নীহারি সংঘশক্তিকে নেতৃত্ব দিয়েছিল শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আর বাদামী নিজেই সংঘের প্রতিক্রিয়া ধারণ করে সড়কি চালিয়ে বুক ফাটিয়ে দিয়েছে অঘোর ঘোষের। বাদামীর এই 'হঠাৎ জেগে ওঠা নিরুপায় আক্রোশ'-এর

পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিশোধবাসনার ইঙ্গিত।

'নেকড়ে' এবং 'চাক ভাঙা মধু'-তে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা তীক্ষ্ণ, সতর্ক এবং সিরিয়াস। তবে 'নেকড়ে' যদি হয় গণনাট্যধারার উত্তরসূরী, 'চাক ভাঙা মধু' তবে নবনাট্যধারার। শোষক-শোষিতের লড়াই, শোষকের পরাজয় এই নাটকেও আছে, তবে তা জীবনের বহুমাত্রিকতাকে অস্বীকার করে নয়। শ্রেণিদ্বন্দ্ব দেখান মনোজ মিত্র, কিন্তু তা দেখাতে বা বোঝাতে শিল্পরূপকে অস্বীকার করেন না ঃ

> "তাদের (জটা ও মাতলা) শ্রেণির প্রতিবাদ ও ক্রোধ তাদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হতে চায়, কিন্তু মনোজ মিত্র সেটা ধীরে সুস্থে, জটা-মাতলা-বাদামীর নানা মজাদার ও বিপন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে তৈরি করেন, দর্শক বা পাঠকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে একবারেই বুঝিয়ে দেন না।"[৬]

সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে আরোপিত আর্দশবাদ আনেন নি তিনি। চরিত্রের পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেই পথেই এগিয়ে নিয়েছেন নাটককে।

১৯৬৮ সালে লেখা 'কালবিহঙ্গ' একাঙ্কটিতে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজ এবং মালিক শ্রেণির স্বার্থে কুসংস্কারের কৌশলী ব্যবহার। ভক্তরামের মতো মানুষেরা পেটের দায়ে ব্যবসা করে মানুষের অন্ধবিশ্বাস নিয়ে। আর এই ব্যবসা করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই তারা কখন যেন মুনাফালোভী শ্রেণির দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে যায়। কারখানার মালিকের দালাল ডাক্তার, অন্ধ উপেনকে চক্ষুষ্মান সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ভক্তরামের 'ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গে'র ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা দেখাতে। ভক্তরাম গভীরভাবে বিশ্বাস করে, তার বিহঙ্গ সত্যিই ত্রিকালজ্ঞ। সেই বিশ্বাসবোধ এমনভাবে চারিয়ে গেছে তার মধ্যে যে, নিজের ছেলের কাছেও সে যন্ত্রের মতো হাতসাফাই করে চলে। এই ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করে মালিক শ্রেণি কীভাবে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য নষ্ট করে, তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয় তার স্বরূপ উন্মোচন করে শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন নাট্যকার। সূর্য শ্রমিকনেতা হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য এবং আদর্শে আস্থাশীল। ভক্তরামের ছেলে খোকার মধ্যে আদর্শবাদ এবং ধর্মবিশ্বাসের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। এই দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেছে ভক্তরামের হাতসাফাই এবং ডাক্তারের ষড়যন্ত্র। দালাল ডাক্তার কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত। ভক্তরাম অসহায় ব্যবহৃত মানুষ। এই নাটকে মনোজ মিত্র ক্রোধী। যে ক্রোধ আমরা দেখেছি 'নেকড়ে' নাটকে, একই বছরে লেখা 'কালবিহঙ্গ' নাটকটিতে সেই ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। কুসংস্কার এবং মুনাফাখোর শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে মনোজ মিত্র এখানে খড়্গহস্ত। তাই নাটকের শেষে খাঁচা ভেঙে ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গকে উড়িয়ে দেওয়া হয়, সূর্যর সংলাপে প্রকাশিত হয় নাট্যকারের ঈপ্সিত বক্তব্য ঃ "মানুষের ভাগ্য চিরকাল লড়াই করে ফেরাতে হয়েছে, চিরকাল তাই হবে, পাখির ঠোঁটে চাকা ঘোরে না।"[৭] শোষকের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমরা দেখেছি 'নেকড়ে' নাটকে, এই লড়াইয়ের কথাই আরো পরে শুনব 'শিবের অসাধ্যি'তে, একটু অন্যভাবে হলেও এই লড়াই-ই করবে বাঞ্ছারাম, সুবর্ণ-হীরামন-নীলকমল বা সাধু তুষ্টুরা।

১৯৬৩ সালে রানিগঞ্জে থাকাকালীন যে 'অশ্বত্থামা' নাটক লিখেছিলেন তা পুনর্লিখিত

হল ১৯৭২-৭৩ সালে। পুরাণের আশ্রয়ে রচিত নাটকে ভর পেল সমকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থা। অত্যন্ত Serious ভঙ্গিতে মনোজ মিত্র এই নাটকে তুলে ধরলেন সমকালীন ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের রাজনৈতিক ভ্রান্তি ও দিশাহীনতাকে। বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষ দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে প্রবল হয়ে ওঠে নকশাল আন্দোলন। বহু উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় যুবক যেমন আদর্শের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনে, তেমনি ঢুকে পড়েছিল অনেক বেনোজলও। আদর্শবাদের মোড়কে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধি করা অনেকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে আন্দোলনে দেখা দেয় বিভ্রান্ত অবস্থা। সেই বিভ্রান্ত যৌবনকে মনোজ মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন অশ্বত্থামা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মহাভারতের নির্দ্বন্দ্ব অশ্বত্থামাকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ যৌবনের প্রতীকে। অশ্বত্থামা আজীবন থেকেছে আদর্শের প্রতি অনুগত, আদর্শ রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু আজ বিপুল বাহিনী নিঃশেষিত হবার পর তার মনে জেগেছে সংশয়। বহু রক্তপাতের পরও তো পান্ডব রয়ে গেছে অধরা, আর দুর্যোধনকে রক্ষা করাও সম্ভব হয় নি। আদর্শ যখন আশ্রয় দিতে পারছে না, তখন কী করবে অশ্বত্থামা ? অনুতাপই কি হবে একমাত্র অবলম্বন ? শত্রু চিহ্নিতকরণেই থেকে গেছে ভ্রান্তি। অকারণ রক্তপাতে দেশ জুড়ে শকুনির মহাভোজ। রক্তগঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগছে, কাদের মারলাম, কেন মারলাম ঃ ''অন্ধ! শত্রু চিনি না। শত্রুকে আঘাত করতে পারি না। শেষ মুহূর্তে ভুল করি। একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খড়্গ কাঁধে আমি জনারণ্যে ঘুরপাক খাই!'' আদর্শ মুখ থুবড়ে পড়েছে, প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তবু প্রকৃত আদর্শবাদীর পক্ষে আদর্শকে ত্যাগ করা কঠিন। অশ্বত্থামা তাই মুমূর্ষু দুর্যোধনকে ছেড়ে যেতে পারেনা। আদর্শের চেয়ে বড় তার কাছে কিছুই নয়। এই আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সে অন্তত একবার জয়ী হতে চায়, নিজের আদর্শকে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। আবার এই অশ্বত্থামাই রক্তপাতে ক্লান্ত, ক্রমাগত স্বজনবধে অনুতপ্ত। রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি দুর্যোধন ব্যবহার করেছে তার যৌবনকে, ব্যবহার করেছে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। যাদের হত্যা করেছে অশ্বত্থামা, তাদের প্রতি তার নিজের কোনো রোষ ছিল না, সব রোষ, সব ঘৃণা সেই রাজার, তারই বিকৃতবাসনা চরিতার্থ করেছে অশ্বত্থামার মতো যৌবন। নিজের কৃতকর্মের যথার্থতা নিয়ে তাই সংশয় জাগে অশ্বত্থামার মনে। অনুতপ্ত হৃদয়ে সে শপথ নেয় ধ্বংসের বিপরীতে প্রাণ সৃজনের।

শেষ চেষ্টাতেও অশ্বত্থামা হত্যা করতে পারেনি পাণ্ডবদের। আবার ভুল করেছে। নিয়ে এসেছে পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ সন্তানের ছিন্নমুন্ড — ধ্বংস করেছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। কিন্তু আশাবাদী মনোজ মিত্র ভ্রান্ত আদর্শের বৈপরীত্যে দেখিয়েছেন সুস্থ আদর্শের জয়। রাষ্ট্রশক্তির পালিত ঘাতকের পক্ষে কোনদিন সম্ভব নয় সেই আদর্শের বিনাশ। তাই গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বেশে কপিধ্বজরথে ছুটে আসে নব যুগের নতুন আদর্শের বাহক — সেই আদর্শের দ্বারাই ধ্বংস হবে ভ্রষ্ট যোদ্ধারা। পাণ্ডবদের যে নতুন আদর্শের বার্তাবহরূপে উপস্থাপিত করেছেন মনোজ মিত্র তা যে আসলে কম্যুনিস্ট মতাদর্শ তার একাধিক ইঙ্গিত আছে নাটকে। একসময় পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তবু সাধারণ মানুষের মধ্যে

তারা অপ্রতিহত গতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নাটকে অশ্বত্থামার সংলাপে সেই বিষয়ের ইঙ্গিত আছে ঃ

> "যে করবে পান্ডবের নামে অশ্রুপাত, চক্ষু উপড়ে নেব তার! আমি অশ্বত্থামা ... দুর্যোধনের অশ্বত্থামা ! ... জনপদবাসী, আমি জানি কুটীরে কুটীরে তোমরা ওদের নামে দীপ জ্বালো! নিভিয়ে দাও! ... আমার আদেশ! আমি জানি, বুকের নীচে লিখে রেখেছ পান্ডবের নাম। মুছে ফেল ... নইলে ছিন্নভিন্ন করব ... পান্ডবের পুনরাগমনের সব পথ রুদ্ধ করব আমি!"[৮]

এখানে 'পুনরাগমন' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে সমাজচেতনার দিক থেকে। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে কম্যুনিস্টরা একবার ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তারা ক্ষমতাচ্যুত হন। 'পুনরাগমন' কথাটি সেই পূর্ব ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়েছে। সেই কম্যুনিস্টদের অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশাতেই নাটক শেষ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ "ঘাতক আমরা, রাজার পালিত ঘাতক ... আমাদের সাধ্য কি কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি। যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে অধর্মের বিনাশে।"[৯]

অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ সালে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা অন্যতর এক পরিবেশ-পরিস্থিতির আকাঙ্ক্ষা করছে এবং সে জন্য বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর আস্থা স্থাপন করছে। রূঢ়, নিষ্করুণ প্রতিবেশে আশাহত মনোজ মিত্র সন্ধান করছেন অন্যতর এক ভূমির, যেখানে ধ্বংসের পরিবর্তে প্রাধান্য পাবে সৃজন, যেখানে হিংসার স্থান নেবে ভালোবাসা।

'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪) এবং 'নরক গুলজার' (১৯৭৪) নাটক দুটিতে দেব-দেবী, স্বর্গ-মর্ত্যের কাহিনির মধ্যে ধরেছেন সমকালীন সমাজের অস্থিরতাকে। নতুন যুগের নতুন দৈত্য হিসেবে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন জোতদারকে, যে জোতদারের থাবা এবং শিং একসঙ্গে আছে। সমকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসঙ্গতির প্রত্যক্ষ ছাপ আছে 'শিবের অসাধ্যি'তে। দেবী দুর্গার মধ্যে রাষ্ট্রনায়িকার ছায়া আছে। 'গরিবি হটাও' স্লোগানের প্রতি ব্যঙ্গ আছে, মিসা আইন এবং ভেসেকটমির প্রসঙ্গ আছে, ক্যাবারে নাচের প্রসঙ্গ আছে। বিদ্যুৎহীন খুঁটি, ভোট নিয়ে জালিয়াতি, রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠীকোঁদল, শাসক-পুলিশ যোগসাজশ, নকশাল আন্দোলনের সময় শিক্ষার অধোগতি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সামাজিক বাস্তবতাকে মনোজ মিত্র জুড়ে দিয়েছেন এই নাটকে। জোতদার-চাষির দ্বন্দ্বে চাষিকে সাহায্য করতে আসেন নেতা, কিন্তু জোতদারের শোষণে ও কৌশলে সেই নেতা শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন। তাই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হচ্ছে মানুষের চৈতন্যের জাগরণের ওপর। 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'তে শোষকের পরাজয় দেখানো গিয়েছিল।কিন্তু ১৯৭৪ সালে নাট্যকার যেন চোখের সামনে কোনো 'কান্তিময় আলো' দেখতে পাচ্ছেন না। তাই 'নেতা' শিব অসহায় ঃ "হল না রে ছিদেম, হল না। জোতদারের ব্যাকিং বহুদূর। দেবতাদেরও কব্জা করেছে। ও ছিদেম, জোতদার শিবেরও অসাধ্যি রে ... শিবেরও অসাধ্যি।"[১০] নাটকের শেষে ছিদেমদের উদ্দেশ্যে শিবের যে পরামর্শ তাও নাট্যদেহ থেকে উদ্ভূত নয়, আরোপিত বলেই মনে হয়। পৃথিবীকে আবার

সুন্দর ও মধুর দেখার যে স্বপ্ন উচ্চারিত হয়েছে তা নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষা ঠিকই, কিন্তু পরিণতির এই আশাবাদে পৌঁছনোর উপযুক্ত ক্রম রক্ষিত হয় নি। গরিবকে বাঁচতে হলে যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে, পরের কাছা ধার করে পার পাওয়া যাবে না — এগুলি সবই সত্য কথা, কিন্তু সত্য কথাকে শিল্পিত আকারে প্রকাশ করাই যথার্থ শিল্প। সেই শিল্পিত রূপটি এখানে অনুপস্থিত। আসলে সেই সময়ে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা অন্ধকার থেকে উত্তরণের কোনো দিশা খুঁজে পায় নি।

'নরক গুলজার'-এও উঠে এসেছে বিশ শতকের সত্তরের দশকের ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপটি। মস্তান, গুণ্ডা, রাজনৈতিক নেতা, মহাজন তখনকার সমাজে শোষকশ্রেণি আর শোষিত হল সর্বহারা, মানিক-ফুল্লরা যে শ্রেণির প্রতিনিধি। শোষক-শোষিতের লড়াই এখানেও প্রত্যক্ষ। গদি টেঁকাতে রাষ্ট্রশক্তি আঁতাত করে শোষকদের সঙ্গে। ব্রহ্মা এখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রতীকরূপে উপস্থাপিত। নাট্যকার এখানে স্পষ্টতই শোষিতের পক্ষে। তাই নাটকের শেষে প্রকাশিত তাঁর তীব্র ক্রোধ। সর্বহারা মানিক তাই জিতে যায় নেংটি-ঘোড়ুই-বাঁটুল-গুঁইবাবার বিরুদ্ধে। মর্ত্যে হবে চূড়ান্ত লড়াই। তাই পুনর্জন্ম হয় মানিক-ফুল্লরার। আর সব শয়তান এবং সেই সঙ্গে ভগবান ব্রহ্মারও পুনর্জন্মের আদেশ হয় — তবে তাদের জন্ম মানুষের নয়, গাভীর। সমস্ত শয়তান এবং তাদের নিয়ন্তাকেও গো-জন্ম দিয়ে মনোজ মিত্র যেন মনের রাগ মেটান। এপিক থিয়েটারের ঢঙে হাসি-মজা-হুল্লোড় এই নাটকেও আছে 'শিবের অসাধ্যি'র মতো, তবে এখানে শিল্পরূপ অনেকটাই সংহত।

'শিবের অসাধ্যি' এবং 'নরক গুলজার'-এ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে। জমিদারতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র এসেছে, কিন্তু মানুষ তো বদলায় নি। গণতন্ত্রের নামে চলছে শোষণ। যারা ছিলেন জোতদার, নতুন যুগে তারাই হয়েছেন মন্ত্রি। সাধারণ মানুষের দুরবস্থা একইরকম রয়ে গেছে। জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর কাজ করছে নতুন যুগের পুলিশ। ত্রিপাক্ষিক প্রভৃতি চতুর কৌশলের মধ্য দিয়ে আসলে চলছে প্রজাশোষণের সেই চিরন্তন কাহিনি। সে সময় পশ্চিমবঙ্গে যেন প্রকৃত অর্থেই চলছে ভূতের রাজত্ব। এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সমাজসচেতন মনোজ মিত্র চিহ্নিত করেছেন সর্বহারার সর্বাত্মক সংগ্রামকে। সেই সংগ্রামে সর্বহারার জয় তাঁর কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু লক্ষণীয় যে, একই বিষয় বলতে গিয়ে 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'তে যে Serious ভঙ্গি নিয়েছিলেন তিনি, 'শিবের অসাধ্যি' বা 'নরক গুলজার' তার পরিবর্তে দেবতা ও ভূতের আধিপত্যে ফ্যান্টাসির দিকে এগোল। হাসি-মজা-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র ব্যবহার করলেন Epic নাটকের ফর্ম। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রত্যক্ষতা এরপর থেকেই এড়াতে শুরু করলেন মনোজ মিত্র। আবিষ্কৃত হল তাঁর নাট্যরচনার বিশেষ ভঙ্গিটি।

১৯৭৪ সালে লেখা মদন সিরিজের দুটি নাটক 'আমি মদন বলছি' এবং 'মদনের পঞ্চকান্ড'তে সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ অবস্থার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সুন্দরের সন্ধানী মদন গ্রাম থেকে শহরে এসেছে সৌন্দর্যের খোঁজে। এই গ্রাম ছেড়ে আসা প্রসঙ্গে

নাট্যকার তুলে ধরেছেন সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সমাজের সংকটের দিকগুলি। খানাখন্দ, ডোবা-নালায় ভরা গ্রামে বর্ষাকালে পাঁকে পথ রুদ্ধ, সর্বত্র পাটপচা দুর্গন্ধ, মানুষের ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় কিছুই নেই। ফসল যা হয়েছে সবই মিলিটারির খাবার হিসেবে ক্রোক করা হয়েছে। ঘ্যাঁটকোলের পাতা হয়েছে মানুষের খাদ্য, তেভাগা আন্দোলনে প্রাণ দিচ্ছে কৃষক। সেই 'অসোন্দর' গ্রাম থেকে গেঁড়ে মদন নগর কোলকাতায় এসেছে সুন্দরের সন্ধানে। কিন্তু সেই অস্থির সময়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র এবং তার সৃষ্ট মদন সর্বত্রই দেখেছেন ঘোর অন্ধকার। জমিদারদের মতো নিজের নিজের এলাকাভাগ করে নিয়েছে মস্তানরা। সবচেয়ে করুণ অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রের। স্কুল-কলেজের ভর্তি থেকে পরীক্ষা — সবই তখন মস্তানদের আওতায়। 'জিপ' হাঁকিয়ে মস্তানরা দাপিয়ে বেড়ায় নির্বাচনের সময়। যুবশক্তি-র উল্লেখ, মিসা এবং ভেসেকটমির আতঙ্ক, রাজনীতিকের 'গান্ধীবাবা' নাম, শিক্ষাক্ষেত্রের অব্যবস্থা, জিপে চড়ে মস্তানদের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ থেকে কংগ্রেস শাসনকালের কথাই স্মরণ করায়। নাট্যকার মনোজ মিত্র স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতের সাহায্যে সেই দুরবস্থাকে ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট মদন বিস্মিত হয়ে দেখেছে ঃ ''কলকাতার বাবুরা ধারালো ছুরি নিয়ে ইনি ওনার পেট ফাঁসালেন, গাড়িতে আগুন ধরালেন, তার ছেঁড়লেন, বোমা ঝাড়লেন ... কীসে থেকে যে কী হলো বাবুমশায়রা, সোন্দর সোন্দর এস্টাচুগুলান কচুকাটা করলেন।''[১১] এই রাষ্ট্রবিপ্লবে সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন নাট্যকার। যে মানুষেরা নিতান্ত সাধারণ, তারা এই রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে বিপন্ন। নিজেদের মাথা বাঁচানোই তাদের পক্ষে কঠিন। 'এট্টা আচ্ছরয়'-এর জন্য তারা ব্যাকুল। মানুষের এই আশ্রয়হীন, অনিকেত অবস্থা এই সময় পীড়িত করেছে মনোজ মিত্রকে, কিন্তু পরিত্রাণের উপায় তিনি দেখাতে পারেন নি। 'নরক গুলজার'-এ সর্বহারা মানিক-ফুল্লরাকে শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছেন, অত্যাচারীদের গো-জন্ম দিয়ে মনের রাগ মিটিয়েছেন, কিন্তু এখানে ভয়াবহ অবস্থার চিত্রণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। তাঁর মদন এই ভেবে আতঙ্কিত হয়েছে যে, শহর ভেসেকটমি করিয়ে তাকে খোজা করে রাখবে। উৎকেন্দ্রিক সেই সময়ে নাগরিক মানুষকে খোজা রূপেই দেখেছেন মনোজ মিত্র।

'সাজানো বাগান' ১৯৭৬-৭৭-এ লেখা নাটক। সামাজিক চেতনার দিক থেকে মনোজ মিত্র এই নাটকেও 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'র সমধর্মী। এখানেও শোষক ছকড়ি-নকড়ির বিরুদ্ধে ভূমিলগ্ন মানুষ বাঞ্ছা কাপালির প্রাণপণ লড়াই এবং সে লড়াইয়ে ভূমির ওপর বাঞ্ছার দাবী প্রতিষ্ঠিত। একদিকে উৎপাদক বাঞ্ছা, অন্যদিকে সংগ্রাহক ছকড়ি-নকড়ি — কে পাবে সাজানো বাগানের অধিকার? নাট্যকারের সহানুভূতি স্পষ্টতই বাঞ্ছারামের দিকে, প্রান্তিক মানুষের দিকে। দড়ি টানাটানির খেলায় তাই জয়ী হয় বাঞ্ছারাম, বাঞ্ছার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনা খাটিয়ার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নকড়ি। যেমন দমিত হয়েছিল কংসারি, অঘোর ঘোষ বা 'নরক গুলজার'-এর সব অত্যাচারীরা, তেমনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ছকড়ি-নকড়ি। প্রবলভাবে বেঁচে থেকেছে জীবনপিয়াসী বাঞ্ছা। এই নাটককে স্পষ্টতই ভূমিলগ্ন মানুষের সঙ্গে ভূমিগ্রাসী মানুষের দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত করেছেন সমালোচকঃ

"The play becomes a glorified tug-of-war between a man rooted to his precious soil and aware of his individuality and a group of thrusting, rapacious individuals whose brittle lives make them crave for power and ultimately lead to their destruction."[১২]

ছকড়ি দত্তকে বাঞ্ছা ঠেকিয়েছে লাঠির জোরে, আর নকড়ি দত্তকে ঠেকিয়েছে প্রাণের জোরে। মাটি ঘষটে চলত যে বাঞ্ছারাম, অন্য মানুষদের সহায়তায় সে ক্রমে ধনুকের মতো বেঁকেছে, তারপর তীরের মতো সোজা হয়েছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা নকড়ি প্রথমে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, তারপর মড়ার খাটে শুয়ে পড়ে মরে গেছে। 'নেকড়ে' নাটকে কংসারি ঠাকুর কিংবা 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে অঘোর ঘোষের আমলে যে গ্রাম ছিল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই গ্রামেরই অন্যতর রূপ দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র 'সাজানো বাগান' নাটকে। সেই রূপটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমালোচক অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ

"চাকভাঙা মধু-র আদিম অন্ধকারময় গ্রামকে ছাড়িয়ে এসে নতুন গ্রামের চেহারা আঁকেন মনোজ, 'সাজানো বাগান'-এ। ছকড়ি-নকড়ি এখানে জোতদার হয়েও যাকে বলে টেবিলের অন্য প্রান্তে। অঘোর ঘোষের প্রবল দাপটের বদলে এরা আশ্রয় নিয়েছে ছলচাতুরির, কৌশলের।"[১৩]

বাঞ্ছা কাপালি তখন শর্ত দিচ্ছে জোতদারকে — তার মৃত্যুর পর কীর্তন করতে করতে, গুজিয়া ছড়াতে ছড়াতে, বোম্বাই খাটে চড়িয়ে বডি নিয়ে যেতে হবে, গব্যঘৃত মাখাতে হবে, আর একটি ষাঁড় উৎসর্গ করে দিতে হবে। কত সহজে বাঞ্ছা উচ্চারণ করেছে দিনবদলের কথাঃ "চেরটাকাল আপুনারাই নোকের দরজায় তাগাদায় গেছেন — লোকে দিয়েছে — আপুনারা নিয়েছেন — আজ আপুনারা দেবেন — আমরা নেবো।"[১৪]

মনোজ মিত্র জানেন, সভ্যতার ইতিহাসে শোষণ চিরন্তন। উৎপাদিত ফসলে চিরকাল পড়েছে লোভী শকুনের দৃষ্টি। শক্তিজীবী সম্প্রদায় বারবার শক্তির জোরে দখল করেছে শ্রমের ফসল। সেই শোষক শক্তিকে তিনি বাঞ্ছার জবানীতে চিত্রিত করেছেন 'অপদেবতা' রূপে ঃ

"আছেরে বৌ, ভূত আছে, কদ্দিন বলে আসছি, ঐ বাগানটা করার পর থেকেই এট্টা ভূত আমার পেছনে লেগেছে। এট্টা কাল অপছায়া আমার সুবজ লতাপাতা ফলফুলুরি ঘিরে ধরেছে। কতো তাড়াই — ছায়াটা সরে না। যুগ যুগ চলে যাবে ... ওই অপদেবতা পিথিবির যেখানে যতো ফসল ... সব গেরাস করবে বলে বসে থাকবে। ... কিছুতে ওরে কাটানো যাবে না রে।"[১৫]

'সাজানো বাগান' নাটকে সমকালে প্রচলিত আরোপিত বিপ্লবের স্লোগান নেই ঠিকই, কিন্তু, এসব সংলাপে নাট্যকারের চেতনার অভিমুখটি বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। যুগ যুগ বাহিত শোষণ বঞ্চনার অবসানে মনোজ মিত্রের অস্ত্র কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়, প্রবল জীবনাসক্তি।

যদিও এই জীবনাসক্তি পরোক্ষে তত্ত্বকেই পুষ্ট করে। বাঞ্ছা কাপালি শুধু জীবনের প্রাবল্য দিয়ে, নিজের বেঁচে থাকা দিয়ে, অস্তিত্ব দিয়ে ধীরে ধীরে অসহায় করে তুলেছে নকড়িকে। যে গড়গড়া জমিদারি শোষণের প্রতীক, নিজের মৃত্যুর আগে সেই গড়গড়ার নল ফাটিয়ে যাবার বাসনা ব্যক্ত করেছে বাঞ্ছা। অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে মনোজ মিত্র আশা করছেন শোষিত মানুষের উত্থান ঘটবে এবং নিজের নাটকে সেই উত্থানেরই একটি রূপ তিনি এঁকেছেন। নাট্যকারের এই চেতনাকে অভিনন্দিত করেছেন সমালোচক নৃপেন্দ্র সাহা ঃ

> ''মুখ্যু চাষীর অধিকার রাখার এই যে লড়াই, জমি নিয়ে বাঁচা-মরার যুযুৎসুর এই প্যাঁচ রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সরল পথ ধরে আসেনি বলেই যে সাজানো বাগান প্রগতিশীল চিন্তার ধারার ফসল নয় এমন কোন সরল সিদ্ধান্তে না পৌঁছে আমরা বরং বলতে পারি শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'চাক ভাঙা মধু'র নাট্যকার 'সাজানো বাগানে' পৌঁছে শোষক শ্রেণীর মুখের উপর তোমার ফলিডল তুমিই বরং খাও বলার সাহস জুগিয়ে দিয়েছে।''[১৬]

সামাজিক চেতনার দিক থেকে পার্থক্য না থাকলেও নাট্যবয়ন কৌশল ও কথনভঙ্গিতে 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'র তুলনায় 'সাজানো বাগান' পৃথক। এই দুটি নাটকে ভঙ্গি ছিল Serious. তারপর 'নরক গুলজার' এবং 'শিবের অসাধ্যি'তে দেখা গেল চরম হুল্লোড়। 'সাজানো বাগান'-এ এসে Serious ভঙ্গি যেমন বর্জিত হল, তেমনি হুল্লোড়ও সংযত হল। জীবনের যে সহজ চলন, যে বক্র রসিকতার উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেছিলেন খুলনা অঞ্চলের জীবনবোধ ও প্রকৃতির সাহচর্য থেকে তাকেই সঞ্চারিত করে দিয়েছেন এই নাটকে। জীবনের সেই স্বাভাবিক চলন থেকেই উৎসারিত হয়েছে প্রত্যয় এবং প্রতিশ্রুতি ঃ

> ''কাঁদে না কাঁদে না দাদা ভাই ... আয় রে পাখি ল্যাজ ঝোলা ... আমার ভায়ের সাথে কর খেলা ... কাঁদে না কাঁদে না ... কতো পাখি আছে আমার বাগানে ...হ্যাঁ ...হ্যাঁ ... ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় ... হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল সকালে দেখো ... কতো আমের বোল ধরছে ... মুক্তোর দানার মতো মাটিতে চাদর বিছিয়ে থাকে ... গুনগুন গুনগুন ... কতো মৌমাছি ফাঁকে ফাঁকে গুনগুন করে ... হ্যাঁ হ্যাঁ ... দেখো, টুপুস টুপুস করে নাতের শিশির ঝরে পড়ছে ... জলপাই-এর পাতা বেয়ে শিশির ঝরে ঝরে পড়ছে ... হ্যাঁ হ্যাঁ ... সব তোমারে দিয়ে যাবো ... তোমার জন্যেই তো সাজায়ে রেখেছি গো ... হ্যাঁ হ্যাঁ ...''[১৭]

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই নতুন, সুস্থ পৃথিবীর অঙ্গীকারেই শেষ হয় নাটক। বাঞ্ছা কাপালির বাগানে নতুন জীবনের সঙ্গে যে নতুন ভোর নামে, জোতদার নকড়িদের মৃত্যুর পর সেই ভোরের জন্যই নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষা এবং আস্থা। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে (১৯৭৪) কোন আশার বাণী শোনাতে পারেননি মনোজ মিত্র, কিন্তু তিন বছরের ব্যবধানে রচিত 'সাজানো বাগান' নাটকে তিনি 'শিবেরও অসাধ্যি' জোতদারের পরাভব দেখানোর মতো প্রত্যয় অর্জন করেছেন।

১৯৭৯ সালে মনোজ মিত্র যখন 'মেষ ও রাক্ষস' লিখলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শাসন দু'বছর অতিক্রান্ত। রূপকথার আদলে রচিত এই নাটকে তিনি যে সময়কালকে চিত্রিত করলেন তা বিশ শতকের সত্তরের দশকের ভারতবর্ষের অস্থির রাজনৈতিক আবহ। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার পর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী এবং জনতা সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আবার তিনি ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বন্দী করা হয়েছে রাক্ষসরাজ বিচিত্রদন্তকে, কিন্তু তাকে বধ করার উপায় পাওয়া যায় নি। তিন বন্ধু সুবর্ণ-হীরামন-নীলকমল হিমপাহাড়ে চলেছে রাক্ষসবধের উপায় জেনে আসতে। পথে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে প্রেতরূপী তিন আমলা — সেনাপতি, বিচারপতি, ধনপতি। যারা বন্দী করেছিল রাক্ষসকে, তাদেরই ভেতরকার দ্বন্দ্বে মুক্ত হয়ে যায় রাক্ষস এবং যৌবনকে ঘাতক বানিয়ে চালিয়ে যেতে থাকে ধ্বংসলীলা। রাষ্ট্রের যে পালিত ঘাতককে আমরা দেখেছিলাম অশ্বত্থামার মধ্যে, তাকেই আবার দেখলাম হীরামন চরিত্রে। যুবশক্তির একাংশকে শাসক শক্তি তখন হাতের পুতুলে পরিণত করেছে। এই যুবশক্তি বোধবুদ্ধিহীন মেষ। শাসকের নির্দেশে তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে। মানুষকে ভেড়া বানিয়ে শাসক যুগ যুগ সিংহাসন দখলে রাখতে চাইছে। মনোজ মিত্র নাটকের একাধিক সংলাপে চিহ্নিত করেছেন সেই সময়ের যন্ত্রণাকে। তপ্ত শলাকায় শিক্ষকের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়ে শাসক রুখতে চেয়েছে চেতনার বিস্তারকে, মানুষ যখনই প্রতিবাদী কণ্ঠ তুলেছে তখনই তার ওপর নেমে এসেছে নির্মম পীড়ন, ভীষণ নখের চিহ্ন দেগে দিয়েছে মানুষের পিঠে। শাসক রাক্ষস যখন হৃতসর্বস্ব, তখন সে সাধুর ছদ্মবেশে নেমেছে গুপ্তহত্যায়। কিন্তু মনোজ মিত্র বিশ্বাস করেন মানুষের শুভ বোধে। তাই হিমপাহাড়ের আগুনে পুড়ে যায় হীরামনের মেষের চামড়া, বেরিয়ে আসে শুদ্ধ মানুষ। সেই মানুষ সুবর্ণ আর নীলকমলকে নিয়ে রাক্ষসবধ করে।

'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে সমকালীন সমাজের ছায়াপাত ঘটেছে প্রবল ভাবে। প্রেতরূপী তিন আমলা যে ভাবে সংঘশক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছে তা থেকে স্পষ্ট, তারা আবার ফিরিয়ে আনতে চায় রাক্ষসের শাসন। কারণ সেই শাসনেই তাদের স্বার্থসিদ্ধি। সেই কৌশল ধরে ফেলেছে নীলকমল ঃ "প্রেত, তোরা সত্যিই প্রেত। পালা বদলের দিনে তোদের খেলা প্রেতের খেলা।"[১৬] পালাবদলের দিনে বিশ্বাস ঘাতক ষড়যন্ত্রীদের এইভাবেই চিনিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। সেই অস্থির সময়ে শত্রু-মিত্র চেনাই কঠিন। মিত্রের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য শত্রু। শুধু কণ্ঠ শুনে বোঝা সম্ভব নয় কে মানুষের পক্ষে, আর কে রাক্ষসের! যে শাসনের অবসান ঘটানো হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ শেষ করতে না পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়। রূপকথার আদল বজায় রেখেই সেই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন নাট্যকার ঃ "দত্যিটাকে সবে আমরা কলসির মধ্যে ভরেছি ... একেবারেই নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে, ও যে আবার পারে জটপাকানো ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে পড়তে!"[১৭] এই দৈত্যের সম্পূর্ণ বিনাশ চান মনোজ মিত্র। তাই নির্ভর করেন মানুষের শুদ্ধ চৈতন্যের ওপর। এই চৈতন্য মানুষ অর্জন করে অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, অনেক যন্ত্রণায় পুড়ে। শেষ পর্যন্ত সেই শুদ্ধ চৈতন্যের মানুষের যৌথ নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই রাক্ষস-শাসনের অবসান ঘটবে বলে বিশ্বাস করেছেন

মনোজ মিত্র। শোষণ-নির্যাতনের অবসান ঘটাতে গেলে সততা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক এই নাটকে তত্ত্বগত ভ্রান্তির কথা বলেছেন। কারণ সংগ্রাম এখানে ব্যক্তিস্বার্থে (রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভ)। সুবর্ণ-হীরামন-নীলকমলের মতো যুবক কোনো মহৎ ভাবনা বা রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞান ছাড়াই কীভাবে রাক্ষসকে বন্দী করে ফেলল, সে সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। মনোজ মিত্র সরাসরি রাজনৈতিক নাটক লিখতে চাননি। রাজনৈতিক তত্ত্বকে আত্মস্থ করে তিনি মানবিক টানাপোড়েনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া নাটকের শেষে তাঁর লক্ষ্য ব্যক্তিস্বার্থ থেকে বৃহত্তর চেতনায় উত্তরণ। তাই প্রথম থেকে ব্যক্তিস্বার্থের কথা বলেছেন। যখন তারা ব্যক্তিস্বার্থ থেকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, কেবল তখনই তাদের দ্বারা রাক্ষসবধ সম্ভব হয়েছে। রাজত্ব পাওয়া বা রাজকন্যা চন্দ্রলেখাকে পাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বহীন বলেই নাটকের শেষে আর তা উল্লেখিত হয়নি। পরিবর্তে এসেছে যৌথ নেতৃত্বের কথা, এসেছে অর্জিত মুক্তিকে রক্ষা করার কথা ঃ "রাজা আর রইল না – আর ওরা তিনজন বলল – দেশকে মুক্ত করেছি আমরা – এবার মুক্তিকে পাহারা দেব আমরা!"[২০] 'আমি' নয় এবার প্রাধান্য পেল 'আমরা'। ব্যক্তি চেতনার পরিবর্তে উঠে এল সমষ্টি চেতনা। তখন পর্যন্ত এই সমষ্টি চেতনাতেই মনোজ মিত্রের আস্থা। তাঁর এই বিশেষ আদর্শবাদে আস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ঃ "হীরামন, সুবর্ণ ও নীলকমলের মনের দৃঢ়তা, রাক্ষস রাজের অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা শোষণ রোধের শপথে কঙ্কের বলিষ্ঠ প্রেরণা অনেকটাই যুগ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শের বাতাবরণ সৃষ্টি করে।"[২১] রূপকথার বর্ম থাকলেও এই নাটক প্রতিফলিত করতে চেয়েছে সমকালের সমাজকেই। সেই সমাজের কু-গুলিকে দেখিয়ে তার প্রতিকারের পথ নির্দেশও করেছেন, তবে সেই উত্তরণের পথ নির্দেশ নির্দিষ্ট মতবাদ-অনুসারী ঃ "রূপকথার বর্ম পরিধান করাইয়া নাট্যকার অলিখিতভাবে সৎ, সাহসী ও আদর্শবাদী সংঘবদ্ধ মানুষেরই জয় সূচিত করিয়াছেন তবে নির্দিষ্ট মতবাদে।"[২২] অর্থাৎ ১৯৭৯ সাল পর্যন্তও আমরা দেখছি, মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে আস্থাশীল। যদিও তত্ত্বগত দিক থেকে হুবহু সেই রাজনৈতিক দর্শনকে নাটকে প্রতিফলিত করা বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইন মান্য করার প্রবণতা তাঁর নাটকে নেই, তবু মোটের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা, জোতদারের অত্যাচার প্রভৃতির প্রতিরোধে বামপন্থী আদর্শেই তিনি আস্থা স্থাপন করেছেন। নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় তিনি যে বলেছেন, রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস আছে কিন্তু দলীয় রাজনীতিতে আস্থা নেই – এ পর্যন্ত আলোচিত নাটকগুলির সমাজচেতনায় সেই বিষয়টিই স্পষ্ট। তাই রাজনৈতিক ভাবনার পাশাপাশি তাঁর নাটকে সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে মানুষের অন্তরস্থিত শুভ বোধের জাগরণ। কারণ তিনি জানেন ঃ "রাক্ষস নিধন করতে হলে সর্বাগ্রে চাই আত্মিক উত্তরণ। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলতে না পারলে সেটা সম্ভব নয়।"[২৩] সব সময় তিনি সমস্যা সমাধানের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের যে বৈজ্ঞানিক সড়ক, সেই সড়কের যাত্রী থাকেন নি, তা থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়েছেন। গণনাট্যের উত্তরাধিকার বহন করেও হয়ে উঠেছেন নবনাট্যের নাট্যকার।

১৯৮১ সালে লেখা 'রাজদর্শন' নাটক থেকে লক্ষণীয়, মনোজ মিত্র প্রত্যক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবকে কিছুটা যেন এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই নাটকে তিনি অযোধ্যার রাজা নন্দের কাল্পনিক রাজত্বকালকে তুলে আনলেন। সাধারণীকৃত সমাজ সমালোচনা এই নাটকেও আছে, তবে আগের নাটকগুলির মতো প্রত্যক্ষত তা কাউকে আঘাত করে না। বাইরের দিক থেকে এই নাটকের কাহিনি এক রাজ পরিবারের। অক্ষম রাজার ভোগবিলাসের কারণে মৃত্যুর ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রাজার অবর্তমানে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সিংহাসন দখলের জন্য লড়াই বাঁধে। প্রজাদের প্রতিনিধি বিদ্রোহী বৃষল শেষ পর্যন্ত সিংহাসন দখল করে। ভিতরের দিক থেকে লোভী ব্রাহ্মণের প্রতীকে সাধারণ মানুষের ভিক্ষা করে অবস্থা ফেরানোর ইচ্ছে এবং তা যে অসম্ভব তা-ই দেখানো হয়েছে। ভিক্ষা বা লোভ পরিত্যাগ করে নিজের শক্তির ওপর নির্ভরতার বিশ্বাসেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চান নাট্যকার। এও একধরণের লড়াই। এই লড়াই হল আত্মশক্তির জাগরণের, আত্মশক্তিতে আস্থা ফেরানোর। ১৯৮১ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রায় চার বৎসর অতিক্রান্ত তখন মনোজ মিত্র বুঝতে পেরে গেছেন শাসন ব্যবস্থা এমন একটা বিষয়, যেখানে শাসকের পরিবর্তন ঘটলেও ব্যবস্থা একই রকম থেকে যায়। স্বজনপোষণ, নীতিহীনতা, আখের গোছানো, রাজত্ব রক্ষায় পিশাচের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা প্রভৃতি ব্যবস্থার সমস্ত ব্যাধিই নতুন শাসনে প্রত্যক্ষ করে তিনি হতাশ হয়েছেন। শনিদেবকে দিয়ে বলানো সংলাপ যেন নাট্যকারের হতাশারই বহিঃপ্রকাশ ঃ

"দেবতা যদ্যপি পারে বদলাতে রাজা .....

পারে না বদলাতে শাসন, এমনি এ মজা!"[২৪]

ব্যবস্থার বদলে তাই তিনি আস্থা স্থাপন করতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের ওপরই। আত্মসুখসর্বস্বতার পাঁকে আবদ্ধ অযোধ্যাপুরীকে ধ্বংস করে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দরিদ্রের সন্তান বৃষলের ওপরই ভরসা করেছেন। অর্থাৎ দরিদ্রের জয় এবং প্রতিষ্ঠা এখানেও তাঁর কাম্য, কিন্তু সেই জয় কোনো বাইরের তত্ত্বের দ্বারা সাধিত হতে পারে বলে মনে করেন নি। ১৯৭৪-এ 'শিবের অসাধ্যি'তে বলেছিলেন পরের কাছা ধার করে পার পাওয়া যাবে না, কৃষককে নিজের অবস্থা নিজেকেই বদলাতে হবে।১৯৮১-তে এসে সেই কথাই বলতে চাইলেন আবার। তত্ত্বের পরিবর্তে মানুষের চৈতন্যের বিকাশেই আস্থা রাখতে চাইলেন।

'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫) নাটকেও অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের জাগরণের ওপরই ভরসা রেখেছেন নাট্যকার। সমাজের দিকে তাকিয়ে এই সময় দেখছেন, মানুষের লোভ লালসা ক্রমশ বাড়ছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শোষণ ও বঞ্চনা। লুব্ধ মানুষ আজ পশুর তুল্য। দুটি শেয়াল তাই এই নাটকে হয়ে ওঠে সামাজিক শেয়ালদেরই প্রতীক। তিন জোতদার ভাই চক্রধর, গদাধর এবং ধ্বজাধর শেয়ালের মতোই ওঁৎ পেতে আছে তুষ্টুর লাশের জন্য। প্রত্যেকেই স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় সেই লাশের মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের স্বার্থের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অন্যতম লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক ঃ "দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে একটি ব্যাখ্যা হল এই যে ব্যক্তিস্বার্থে শোষকদের মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে – আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে তা সত্য, আমাদের সমাজেও তা সত্য।"[২৫] সেই দ্বন্দ্বই "শেষ পর্যন্ত তুষ্টু ছকু ও ঢ্যাঙাকে এক সরলরেখায় দাঁড় করিয়ে

মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধে গণসংঘর্ষ গড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে।''[২৬] তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকে আমরা দেখেছিলাম রহিমের ট্রাজেডি কেবল হাকিমুদ্দির শোষণের ফলে হয়নি, ধর্মীয় সংস্কারও সেখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। মনোজ মিত্রের এই নাটকেও সামাজিক শোষণ ছাড়াও তুষ্টুকে পীড়িত করেছে তার ধর্মীয় সংস্কার। জীবন-বিস্মৃত আচারধর্ম নিয়ে সে মেতে উঠেছিল। তুলসী লাহিড়ীর রহিম আত্মহত্যা করেছিল, কিন্তু মনোজ মিত্র যে কোনো অবস্থাতেই মানুষকে পরাজিত দেখতে চান না। তাই প্রথমে তুষ্টু আত্মহত্যা করেছে বলে মনে হলেও শেষে গাছ থেকে নেমে আসে জটাভার মুক্ত 'জ্যান্ত' তুষ্টু। এই তুষ্টু নতুন বোধে উত্তীর্ণ, নতুন চেতনায় উদ্দীপিত। তাকে নিয়ে স্বার্থপর মানুষদের সমস্ত পরিকল্পনা সে ভেস্তে দেয়। ক্রুদ্ধ নাট্যকার 'নরক গুলজার'-এ যেমন অপরাধীদের গো-জন্ম দিয়েছিলেন, এখানে তেমনি শেয়াল-রূপী মানুষকে শেয়ালের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদিয়েছেন। ক্রোধ তীব্র বলেই এই নাটকে কৌতুকের অবকাশ কম। মন্দ চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত। মানুষের লোভ এবং স্বার্থপরতার পাশাপাশি অশুভ রাজনীতিক, ভণ্ড ধার্মিক, ঠক ব্যবসাদার, রাজনীতির নিয়ন্ত্রক মস্তান — সকলেই এই নাটকে মনোজ মিত্রের ক্রোধের লক্ষ্য হয়েছেন, হয়েছেন কোনো নির্দিষ্ট কালখণ্ডের পরিচিতিতে নয়, বরং যে কোনো কালের সাধারণীকৃত রূপ হিসেবে।

'নেকড়ে' (১৯৬৮) থেকে শুরু করে, 'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫) পর্যন্ত নাটকগুলিতে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনার ধরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তিনি মূলত শোষিত, পীড়িত, দরিদ্র মানুষের জয় চাইছেন যে কোনো মূল্যে। তিনি যেহেতু কোনো রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার বহন করেননি, কিংবা কোনো দলীয় রাজনীতিতে আস্থাশীল হতে পারেননি, তাই তাঁর এই চাওয়া কোনো বিশেষ তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয় নি। জীবনকে তিনি জেনেছেন তত্ত্বের চেয়ে অনেক বড় হিসেবে। তাই জীবনের অভিজ্ঞতাকে, জীবনের উপলব্ধিকে স্থান দিয়েছেন তত্ত্বের ওপরে। কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, দলীয় রাজনীতিতে আস্থা না থাকলেও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ যে তাঁর আছে, একথা মনোজ মিত্র নিজেই স্বীকার করেছেন। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি নিজের সেই মতাদর্শকেই ভিত্তি করেছেন বলে জানিয়েছেন ঃ ''আমার নাটকে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিই উপজীব্য। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণের পিছনে রাজনীতি অবশ্যই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আমার নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে। তবে দলীয় রাজনীতিতে আস্থা নেই।''[২৭] নিজের মতাদর্শগত বিশ্বাস নিয়েই তিনি সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ থেকেছেন। তাঁর চেতনায় মতাদর্শের প্রতি যে বিশ্বাস নিহিত, তা স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে নাটকে বর্ণিত সমস্যার সমাধানে। এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাট্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

> ''মনোজ মিত্র কখনোই কমিউনিস্ট পার্টির বা গণনাট্যের আওতায় ছিলেন না কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে জমিদার ও জোতদার সম্পর্কে, মহাজনিপ্রথা সম্পর্কে গণনাট্যের বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব এবং তার অনুসরণে রচিত গণনাট্যগুলির সঙ্গে মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু', 'শিবের অসাধ্যি' 'সাজানো বাগান' অথবা 'নৈশভোজে'র খুব একটা পার্থক্য নেই।''[২৮]

উৎপল দত্ত যে প্রোপাগান্ডা এবং অ্যাজিটেশন-এর কথা বলেছিলেন, মনোজ মিত্রের 'শিবের

অসাধ্যি' বা 'নৈশভোজে'র মতো নাটকে সেই প্রোপাগান্ডা যথেষ্ট রয়েছে বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথবাবু। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকের শেষে যে শোষিত মানুষের উজ্জীবনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে অ্যাজিটেশনের প্রকৃত শক্তি হিসেবে শোষিত মানুষ স্বীকৃতি পেয়েছে বলে তাঁর অভিমত। অর্থাৎ চেতনাগত সাদৃশ্যের কারণে এই নাটকগুলিতে মনোজ মিত্র গণনাট্যধারার সহযাত্রী, আর দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে নবনাট্যধারার বাহক।

মনোজ মিত্রের সমাজচেতনার একটি ধারায় যেমন রয়েছে এই প্রতিবাদী নাটকগুলি, যেগুলিতে তিনি প্রধানত ক্রোধী এবং শোষিত নিপীড়িত মানুষের জয় প্রতিষ্ঠায় উৎসুক, অন্যধারায় তেমনি রয়েছে বিশেষ সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তি মানুষের জীবনসমস্যা-আশ্রিত নাটকগুলি। নিজের প্রথম নাট্যরচনা 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯) থেকেই এই ধারাটির সূচনা। নিজেরই পরিবারে দেখা এক ব্যক্তি এবং কিছু ঘটনা তুলে ধরে সেই নাটকে তিনি দেখিয়েছিলেন পরিবারে প্রান্তিক মানুষের অসহায় অবস্থানটিকে। এই ধারাতেও তিনি সবসময় দুর্বল, অসহায়, প্রতিবন্ধী, ভালোবাসার কাঙাল মানুষের পাশে থেকেছেন, সেই মানুষদের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন মর্যাদার ভূমিতে। 'পাখি' নাটকে তাঁর নায়ক তাই হ্যারিকেনের সেলসম্যান হয়েও অন্তত একদিনের জন্য অতিক্রম করতে চায় নিজের সীমাবদ্ধতা। নিষ্করুণ সমাজে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে বহু বাধা। গ্রামে থাকা বৃদ্ধা মায়ের চিন্তা উদ্বেগ বাড়ায়, পাওনাদাররা বাড়িতে উৎসবের আয়োজন দেখে একে একে এসে হাজির হয় এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ভাঙা টাকা প্রত্যেকেই কিছু কিছু নিয়ে যায়, সবশেষে বন্ধুদের চিঠি পড়ে জানতে পারে, তাকে খরচের হাত থেকে বাঁচাতে কেউ নিমন্ত্রণ খেতে আসছে না। সহমর্মী নাট্যকার কিন্তু ব্যর্থ হতে দেন না তাদের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী — তাদের 'সাতুই ফাল্গুন'কে। তাই অন্ধকারে ছিন্ন আয়োজনের ওপর সত্য হয়ে থাকে শ্যামার জ্বালা পাঁচটি মোমবাতির অনির্বাণ শিখা। সমাজের উঁচু তলার মানুষের জীবনে যখন লোভ, স্বার্থপরতা আর কৃতঘ্নতারই প্রাধান্য, তখন মনোজ মিত্র অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করলেন স্নেহ-মায়া-মমতার প্রস্রবণ। 'টাপুর টুপুর' নাটকে মরালী-কেষ্টদুলালের মধ্যে সম্পর্কের যে বাঁধন তা পলিশ্‌ড নয়, কিন্তু নিখাদ।

'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯) লেখার পরের বছরই তিনি লিখলেন দুটি নাটক 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০) এবং 'পরবাস' (১৯৭০)। বৃহত্তর সমাজ এবং রাষ্ট্রে যখন চলছে শোষণ পীড়ন বঞ্চনা, মূল্যবোধের অবক্ষয় যখন সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করছে তখন পরিবার জীবনে উঁকি দিয়ে সেখানকার অবস্থাটা যেন দেখে নিতে চাইলেন মনোজ মিত্র। সেখানেও তখন একইরকমভাবে চলছে মূল্যবোধের অবক্ষয়, লোভ-হিংসা-স্বার্থপরতার কর্দয উপস্থিতি। 'মৃত্যুর চোখে জল'-এ যে বৃদ্ধকে দেখেছিলাম সিঁড়ির নিচের অন্ধকার ঘরে, 'কেনারাম বেচারাম'-এ তিনিই তো বেচারাম, তিনিই তো ক্রমাগত উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ি থেকে। এই হেড অব দি ফ্যামিলিদের চমৎকার উপমিত করেছে বেচারাম ঃ ''ইংরেজি ভাষার অ্যাপসট্রপি। মাথার পরে সাজানো থাকে কোনো উচ্চারণ নেই। আমরা বুড়ো মা-বাপও তাই। হেড অব দি ফ্যামিলি ... নো প্রোনানশিয়েশান।''[২৯]

পরিবারের মাথায় এদের আলঙ্কারিক উপস্থিতি কিন্তু কোনো কথা বলার ক্ষমতা নেই। কোনো উচ্চারণ নেই। মূল্যবোধের অবক্ষয় কোন পর্যায়ে গেলে কেবল সম্পত্তির জন্য একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে 'বাবা' বলে স্বীকার করে নেয় মানুষ, তা দেখে শিউরে উঠেছেন মনোজ মিত্র। বিপ্লবী ছোটো ছেলে থেকে শুরু করে পাড়ার রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত প্রত্যেকেই লোভী। কারো লক্ষ্য সম্পত্তি, কারো বা ফলস্ ভোট। এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নিজের মতো করে লড়াই চালিয়েছেন মনোজ মিত্র। সংসার যাদের বাতিল করে দিতে চায়, অপ্রয়োজনীয় বলে দূরে ফেলে দিতে চায় — তিনি তাদের সমাজ-সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই তিনি সৃষ্টি করেন টোটনের মতো শিশু চরিত্র। লোভ-হিংসা-স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে যে বড় করে তোলে মানবিকতাকে, মানবিক সম্পর্ককে। এই মানবিকতারই সন্ধান করেন মনোজ মিত্র। বিশ্বাস করেন, সমাজে কোথাও না কোথাও শেষপর্যন্ত থেকে যায় সেই মানবিকতার অস্তিত্ব।

'পরবাস' নাটকে মানবিকতার স্পর্শ গজমাধব পেয়েছে আর এক অনিকেত মন্দিরার কাছে। দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষকে আশ্রয় এবং জীবিকার সন্ধানে ভারতে আসতে দেখেছেন মনোজ মিত্র। যে মানুষেরা ওপারে ছিলেন যথেষ্ট স্বচ্ছল, এপারে এসে তারাই পড়েছিলেন নিতান্ত দুরবস্থায়। বেলগাছিয়া ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাসাবাড়িতে তখন থাকছেন মনোজ মিত্ররা। খুলনা যশোরের মানুষের কোলকাতায় প্রবেশপথের ধারেই সেই বাসাবাড়ি। ফলে পরিচিত, অর্ধপরিচিত অনেক মানুষের কাছেই তা ছিল 'ট্রানজিট হাউস'। সেই সূত্রে অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষকে তিনি দেখেছেন এবং তাদের আশ্রয় ও জীবিকার সমস্যা উপলব্ধি করেছেন। সেই সামাজিক সমস্যাই ভর পেয়েছে 'পরবাস' নাটকেও। বিষণ্ণ কৌতুকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন ছিন্নমূল মানুষের কাছে নগর কোলকাতায় একটা আশ্রয় তখন কত জরুরি। আবার সামাজিক সমস্যার মধ্যে ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্যও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে নিজের আশ্রয়ের বিনিময়ে তাঁর গজমাধব দেখতে চায় আর এক আশ্রয়হীনা মন্দিরার জীবনের পূর্ণতা।

১৯৭৮ সালে লেখা 'দম্পতি' ('শুকসারী') নাটকে তিনি আবার দেখালেন পারিবারিক বৃত্তে অবক্ষয়ের রূপ। এখানেও লোভের কেন্দ্রে সম্পত্তি। কর্মসূত্রে পরিবার বিচ্ছিন্ন — একজন আসাম একজন দিল্লি। বাড়ি আগলে রয়েছে বৃদ্ধ দম্পতি। এই বাড়ি বিক্রি করে টাকা এবং বাবা-মাকে ভাগ করে নিতে চায় দুই ছেলে। বাড়ির প্রতি মমতা, বাবা-মায়ের মত কিছুই তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কিন্তু নাট্যকার মনোজ মিত্র শৈশবেই জেনেছেন ভিটে থেকে উৎখাত হবার যন্ত্রণা, তাই কর্তা-গিন্নিকে তিনি উৎখাত হতে দেননা, জিতেনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন বাড়িতে। জিতেনের মতো চরিত্র বাস্তবে সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু নাটক বয়নের নিপুণ কৌশলে এই চরিত্রকে অসঙ্গত মনে হয় না। নাট্যকার মূল্যবোধের পুনঃস্থাপন করবেনই — এটা তাঁর লড়াই। সেই লড়াইয়ে অসহায় মানুষ, দুর্বল মানুষকে তিনি জয়ের পথে ফেরাবেনই। এই নাটকে ওপর নীচে দু'জোড়া দম্পতিকে দেখিয়ে পুরনো এবং আধুনিক মানসিকতার, বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। কর্তা-গিন্নির মধ্যে চরম বিরোধ,

কিন্তু তা শুক-সারীর মতোই আপাত বিরোধ — ভেতরে রয়েছে গভীর মিল। কিন্তু ওপরতলার আধুনিক দম্পতি শ্যামল-বকুলের মধ্যে সহনীয়তার নিতান্ত অভাব। বিচ্ছেদই তাদের দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধানের সহজ পথ। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তথাকথিত আধুনিকতার প্রতি নাট্যকারের বিরূপতা গোপন থাকেনি।

মানুষের যখন বড় কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষ যখন ক্রমশ হীন হয়ে পড়ছে তখন মনোজ মিত্র সৃষ্টি করলেন এক সর্বংসহা বিরাটহৃদয় মাতৃচরিত্রকে, সৃষ্টি করলেন অলকান্দাকে ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'-১৯৮৮) সমাজ যখন পঙ্গু, অসহায়-অপ্রকৃতিস্থ — তখন দিলেন মায়ের শুশ্রূষা। পঙ্গুতা, স্থবিরতা এবং অস্বাভাবিকতাকে সময়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মনোজ মিত্র। রজনীনাথ, দেবাহুতি, শুভ, জয়দীপ সেই পঙ্গু, অসুস্থ সময়ের প্রতিনিধি। এই সময়ই তো চরম প্রয়োজন মায়ের মমতার। মনোজ মিত্র বিশ্বাস করতে চান, মানুষের মধ্যেই আছে শুভবোধ। চরম প্রয়োজনের সময়ই তার জাগরণ ঘটে। সেই বিশ্বাসকে চিহ্নিত করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক ঃ

> "খলতা, নিষ্ঠুরতা, দুর্যোগের আকস্মিকতা সত্ত্বেও জগৎ সংসার যে এখনও টিকে আছে, তার কারণ, কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অসহায়কে আশ্রয় দেন। ... বিরূপ অবস্থাতেও যখন তাঁরা সামাজিক বিরক্তি, সাংসারিক ক্লিষ্টতা, আপন দুঃস্থতা উপেক্ষা করে অসহায়ের পাশে এসে দাঁড়ান, তখন মানুষের মহত্ত্ব যত ছোট আকারেই হোক না কেন স্বীকার না করার উপায় থাকে না।"[৩০]

এই মহত্ত্বকেই তো স্বীকৃতি দিতে চান মনোজ মিত্র। তাঁর সমাজচেতনা অলকানন্দার মতো মায়েদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার কথা বলে। অলকানন্দার সঙ্গে গোর্কির মা এবং বাস্তবের মাদার টেরেজার তুলনা করে সমালোচক বলেছেন ঃ

> "সাহিত্য ক্ষেত্রে গোর্কির মা এক অনন্যসাধারণ চরিত্র। কিন্তু তাঁর প্রেক্ষাপটে ছিল শ্রমিক আন্দোলন, তাঁর কাজে ছিল গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য। আর বাস্তব ক্ষেত্রে এই পশ্চিমবাংলায় আমাদের মধ্যে রয়েছেন মাদার টেরিজা। ... তাঁর আছে প্রাতিষ্ঠানিক জোর। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সেই মহৎ মাতৃত্বের প্রসাদ অকাতরে বিতরণ কি একেবারেই অসম্ভব ?"[৩১]

সম্ভব কি না, সেই পরীক্ষাই যেন নাট্যকার করেছেন অলকানন্দা চরিত্রে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, ধ্বস্ত সমাজকে সুস্থ করতে, মানবিকতাকে উজ্জ্বল করে তুলতে একজনের প্রয়াসে আরো অনেকের সহযোগিতা প্রয়োজন । রজনীনাথের সায় না থাকলে, বাদলের সহযোগিতা না থাকলে অলকানন্দার পথ চলা দুরূহ হ'ত । নাটকের শেষেও তাই সে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে। মনোজ মিত্রের মতোই তাঁর সৃষ্ট অলকানন্দাও বিশ্বাস করে যে, ভিতরের অন্ধকারটাই সব নয়, বাইরের আলো তার চেয়ে অনেক বড় । জমাট বাঁধা অন্ধকারকে নাশ করবেই ভোরের আলো । মানুষকে এই আলোর দিকেই নিয়ে যেতে চান নাট্যকার । তাই সমকালের একাধিক সংকট নিয়ে যুগের এক জটিল যন্ত্রণাদীর্ণ ছবি এই নাটকে ফুটে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে থাকে নাট্যকারের সহানুভূতির বোধ। সমালোচকের কলমে সেই বোধেরই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ঃ

> ''মনোজ মিত্রের এই নাটকে অনেকগুলো বিষয় একের সঙ্গে অন্যে জড়িয়ে আছে বলে জটিল আধুনিক জীবনের একটা ছবি ফুটে ওঠে। মাতৃত্ব, পোষ্য সন্তানের সংকট, নারীমুক্তি, চরিত্রর ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়া, র‍্যাগিং-এর আঘাতে কিশোর মনের বৈকল্য, সবই দেখা হচ্ছে একটি বাস্তববোধসম্পন্ন অথচ সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে।''[৩২]

অর্থাৎ সামাজিক অবক্ষয়কে রুখতে এই পর্যায়ে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতাকেই আশ্রয় করেছেন মনোজ মিত্র।

'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'(১৯৮৮) থেকে মনোজ মিত্রের সমাজ-রাজনীতি চেতনায় একটা বদল লক্ষ করা যায়। দলীয় রাজনীতিতে আস্থা না থাকলেও গণনাট্যের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী নাটকগুলির সাদৃশ্যের কারণ, শাসনক্ষমতায় মতাদর্শগত বদল ঘটলে গুণগত পরিবর্তন ঘটবে – এই আশা। কিন্তু ১৯৮১ সালে 'রাজদর্শন' নাটকের সময় থেকেই সম্ভবত তাঁর মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু করেছে। ফলে সামাজিক কারণগুলির দিকে তাঁর নিক্ষিপ্ত তীর অনেকটাই সাধারণীকৃত হয়ে গেছে। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'-য় এসে তাঁর স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছে যে, মানুষ – কেবল মানুষই পারে নিজের ভেতরকার মহৎ শক্তিকে উজ্জীবিত করে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে। এখান থেকে এই যে সাধারণীকৃত সমাজ-সমালোচনার সূত্রপাত, এর কারণ নিহিত রয়েছে নিজের নাট্যরচনার কালকে নাট্যকার কর্তৃক চিহ্নিত করার মধ্যে। সেখানে নবনাট্যের সময়কে বিবৃত করার পর তিনি বলেছেন ঃ

> ''এটা কি সেই বিশেষ সময়টার গুণে – যখন ভারতবর্ষের মাটিতে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যের, সর্বস্তরে সামাজিক দুর্নীতির টাইমবোমা পোঁতা হচ্ছিল ? অথবা সর্বকালই আসলে এরকম ? এখনও তাই ? আমরা দেখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি বলেই ঠাওর করতে পারছি না ? পৃথিবীতে এসব গোলাবারুদ হয়তো সবসময়ই পোঁতা হচ্ছে – কালকের মজুত আজ ফাটছে, আজকের সঞ্চয় আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করছে।''[৩৩]

বিশ শতকের শেষের দিকের এই লেখায় মনোজ মিত্র বলতে চাইলেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক দুর্নীতি সব কালেই ঘটছে। দেখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কথা বলে বাংলা নাটকের একদেশদর্শিতাকেই তিনি কটাক্ষ করেছেন। নিজে এই একদেশদর্শিতার দ্বারা আক্রান্ত হতে চান না বলেই সব যুগেই তাঁর নাটকে সমাজ-রাজনীতির শঠতা এবং ভণ্ডামি আক্রান্ত হয়েছে। কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে তিনি সত্যভাষণে পিছুপা হন নি।

'কিনু কাহারের থেটার'(১৯৮৮) নাটকে কিনুর 'গুরুচণ্ডালী' থিয়েটারের খোলসে যেমন তিনি অনায়াসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সমকালকে। স্বার্থপর রাজা-উজির, বিদেশি শাসকের প্রতিনিধি, ভণ্ড সাধু, ঘন্টাকর্ণ এবং উদাসিনীর মতো ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবহৃত মানুষ – এককথায় সমকাল তথা চিরকালের গোটা সমাজটাই এই নাটকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। মনোজ মিত্র দেখাতে চান, যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অশ্বত্থামা বা হীরামন, ঠিক সেভাবেই সব যুগে

ব্যবহৃত হয় ঘন্টাকর্ণরা । উঁচু পদে আসীন মানুষদের চারিত্রিক স্খলন, ভন্ড গুরুর ফেরেববাজি, শাসকের কূটকৌশল ইত্যাদি সবকিছুই এখনে নাট্যকারের কটাক্ষের লক্ষ্য হয়েছে কিনু বা ঘন্টাকর্ণের মাধ্যমে। 'কিনু কাহারের থেটার'-এর মতোই 'পুঁটি রামায়ণ'( ১৯৮৯-৯০)-এ হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচীসহ একালের গোটা সমাজটাকেই মনোজ মিত্র ভরে দিয়েছেন রামায়ণের খোলসে । এই নতুন রামায়ণে পুঁটিরাম বাগচীই নায়ক। রাবণ হ'ল জগতের আদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাষ্ট্রনায়ক, কালনেমি 'পলিটিকাল অ্যাডভাইসার', ইন্দ্রজিৎ 'মেজর জেনারেল'। বিশ শতকের পুঁটিরাম রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কায় ঢুকে গিয়ে সেখানে চালু করেছে বিশ শতকের এক একটি ব্যবস্থা । সেই সুযোগে নাট্যকার মনোজ মিত্র আধুনিক সমাজের কলুষগুলির দিকে কটাক্ষ করেছেন। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, সংসদে জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি, বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, তদন্তের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি সবকিছুকেই তিনি কৌতুকের শরে বিদ্ধ করেছেন । বিশ শতকের ভারতে তিনি দেখেছেন সিস্টেম-সর্বস্বতা । গণতন্ত্র রক্ষার নামে সিস্টেমের জাল এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে যে, তা থেকে বেরনো কঠিন । সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ফাঁক । সেই ফাঁকের সুযোগে সকলেই আখের গোছায় । ব্যথিত নাট্যকার লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষক-পুরোহিত-রক্ষী-মন্ত্রি সকলেই লুব্ধ, সকলেই ভ্রষ্ট । মানুষের এই অবনমনে কষ্ট পেয়েছেন মনোজ মিত্র, কারণ মানুষই তাঁর কাছে চরম সত্য । সেই কষ্টের প্রকাশ বৈদ্য-র সংলাপে ঃ ''ভালো হচ্ছে? আপনি বলছেন ভালো হচ্ছে ? পাঁচ টাকার ওষুধ দিয়ে রোজ পাঁচ হাজার টাকার বিল করছি! টাকা নিচ্ছি আর বাড়ি ফিরে শুধু কাঁদছি! আপনারা কাঁদেন না অ্যাঁ, টাকা মেরে আপনাদের মন খারাপ হয় না!''[৩৪] এই কষ্টই ক্রোধের উৎসস্থল । তীব্র ক্রোধে মনোজ মিত্র প্রত্যাখ্যান করেন এই আধুনিকতাকে, যা মানুষকে নষ্ট করে, ভ্রষ্ট করে। নিজের চারপাশে যখন দেখেছেন সিস্টেমের ফাঁসে শাসন অথর্ব, যখন দেখেছেন রাজনীতিকদের তীব্র ক্ষমতালোভ, দেখেছেন বিবেক-মনুষ্যত্ব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি অনুভব করেছেন, মানুষের মধ্যে ক্রমশ অশুভ সত্তা বিস্তৃত হচ্ছে। তাঁর সৃষ্ট বক্কেশ্বর তাই বলে দেয় সার কথাটি ঃ ''আধুনিক হতে মামা কুলাঙ্গার চাই।''[৩৫] মনোজ মিত্র বলতে চান, এই কুলাঙ্গার সত্তা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে, কেবল বেরিয়ে আসার জন্য উপযুক্ত অবসর চাই । বৈদ্যর মতো চরিত্রর মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের অবমাননায় নাট্যকারের বেদনা প্রকাশ পেলেও এই নাটকে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো ইঙ্গিত যেন তিনি দিতে পারছেন না । তথাকথিত আধুনিকতার ওপর আস্থাই যেন হারিয়ে ফেলছেন ।

১৯৯০ সালে মনোজ মিত্র যে 'শোভাযাত্রা' নাটক লিখলেন সেখানে সমাজকে এবং সামাজিক অবস্থায় পতিত মানুষকে দেখলেন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। 'নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু', 'সাজানো বাগান', 'নরক গুলজার' প্রভৃতি নাটকে জমিদার-জোতদারদের দেখেছিলেন অত্যাচারী শোষক হিসেবে। সে শোষকের পরাজয় ঘটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু 'শোভাযাত্রা'য় সামন্ততন্ত্রের উত্তরপুরুষ ধনগোপালের অসহায়তার দিকটি তিনি তুলে ধরলেন । সমকালীন সমাজব্যবস্থায় যে জমিদারি ব্যবস্থা বিস্মৃতপ্রায়, যা স্মৃতিতে কখনো কখনো উঁকি দেয় কেবল অত্যাচার ও শোষণ-পীড়নের ভার নিয়ে, যে ব্যবস্থা পার করে এসে মানুষ স্বস্তিবোধ করেছে – সেই ব্যবস্থারই এক অবশেষকে এই নাটকে যে মনোজ মিত্র অবলম্বন করলেন,

তার কারণটি নির্ণয় করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ

> ''এই সময়, যে সময় আচরণে চণ্ডাল, স্বভাবে উত্তাল, সে সময়ের প্রেক্ষাপটে নাটকটি পল্লবিত হয়েছে একটি প্রাচীন জীর্ণ জমিদারবাড়ি, সেই বাড়ির কয়েকটি চরিত্র ও এক বিবর্ণ রথকে ঘিরে। কথা হচ্ছে, চলতি সমাজব্যবস্থায় যা পরিত্যক্ত এবং গুরুত্বহীন, তা এই নাটকে এতটা গুরুত্ব পেল কেন ? পেল তার কারণ, শিল্প-সাহিত্যের যিনি প্রকৃত স্রষ্টা তিনি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনকে সমাজের চলতি প্রবণতা থেকে প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন করতে জানেন। পেল তার কারণ, বিষয় নয়, বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যেই তিনি তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করে থাকেন। অর্থাৎ সমাজ যা যেভাবে দেখায়, তাই তিনি দেখেন না এবং এখানেই তিনি আর পাঁচজনের চাইতে আলাদা।''[৩৬]

প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টির বিপরীতে তাই মনোজ মিত্র এই নাটকে দেখতে চেষ্টা করেছেন সত্যের অন্য পিঠটি এবং সে পিঠটিও তাঁর দৃষ্টিতে আর এক সত্য বলেই প্রতিভাত হয়েছে। 'শোভাযাত্রা' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় তাই হয়ে উঠছে ঃ ''সেই বিপন্ন মানুষ, সময় ও সমাজের কাছে যুগে যুগে যে শুধু অভিযুক্ত হয়ে নির্যাতিত হয় কিন্তু প্রকৃত বিচার পায় না।''[৩৭] প্রকৃত সামাজ-সচেতন শিল্পীর পক্ষেই কেবল সম্ভব সত্যের এই বিপরীত রূপ ফুটিয়ে তোলা; নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সময়কে বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণ আগে থেকে প্রতিপাদ্য ঠিক করে নিয়ে করা নয় বলে এর সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত অনুভূতি হয়। সেই অনুভূতিকেই ব্যক্ত করেছেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ঃ

> ''জমিদার অথবা জোতদার বাংলা নাটকে ভিলেন হয়, তাদের আক্রমণ করে অনেক নাটক প্রযোজিত হয়েছে, শেষ দৃশ্যে লাল মশাল জ্বালিয়ে, কিন্তু সেই জমিদার পরিবারের শেষ নিঃস্ব বংশধরকে সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায় এনে, এই প্রথম এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরী করলেন মনোজ মিত্র।''[৩৮]

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যেন দ্বিধা জাগে — ধনগোপালকে নদুর দৃষ্টিতে ঘৃণা করা উচিত অথবা তার প্রতি সহানুভূতি বোধ করা উচিত? নাট্যকার এমনভাবে সামাজিক অবস্থায় পতিত এই চরিত্রটিকে আঁকেন যে, তার প্রতি আমাদের সহানুভূতিই জাগে।

'শোভাযাত্রা' নাটকটি রচনার পেছনে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বাস্তবতার অভিঘাত দেখেছেন সমালোচক নৃপেন্দ্র সাহা ঃ

> ''সারা ভারত জুড়ে যখন ধর্মীয় রথের রাজনীতি দেশটাকে সাম্প্রদায়িক ভেদচিহ্নে টুকরো করতে উন্মত্ত, তখন আমাদের নাট্যকার এক পারিবারিক ঐতিহ্যের ধর্মীয় বিশ্বাসের রথকে সামাজিক বিশ্বাস ও সংহতির রথে রূপান্তরিত করে দেখিয়ে দিলেন যে, সাহিত্য-শিল্প ও নাট্যর সামাজিক উপযোগিতাবাদে কেবল মার্কসবাদী বস্তুবাদীরাই বিশ্বাস করেন না, অমার্কসবাদী বস্তুবাদীরাও মান্য করেন।''[৩৯]

বলা বাহুল্য, এই উক্তিটিতে লালকৃষ্ণ আদবাণীর ভারতব্যাপী রথযাত্রার কথাই বলা হয়েছে। বাস্তব যে ঘটনারই অভিঘাত এই নাটক রচনার পেছনে থাকুক না কেন, এখানে মনোজ মিত্রের প্রধান লক্ষ্য পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে পর্যবেক্ষণ। এই

কাজটি করতে গিয়ে তিনি কিন্তু সাধারণ সামাজিক সত্যগুলিকেও পাশ কাটিয়ে যান না। তাই তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নতুন কালের গ্রামজীবনে রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা। এই দল যে বামপন্থী দল তাও স্পষ্টই বোঝা যায় রাজনৈতিক কর্মী উদয়ের আচার-আচরণে। বিবাদ সালিশীর নামে পার্টি ততদিনে ঢুকে পড়েছে প্রত্যেক পরিবারের অন্দরমহলে। পার্টির নেতার ইচ্ছেই প্রকৃতপক্ষে আদেশ। সবটা ঠিক করে দিয়েও আলগোছে নিজেকে সরিয়ে রাখা পার্টিকর্মীদের কৌশল। উদয়ের সংলাপে সে কৌশলেরই প্রকাশ ঃ ''না দাদা, আমার হ'ল ঘটকের কাজ। বিয়ের আসরে ঘটকের থাকতে নেই। যা করবেন নিজেরা নিজেরা।''[৪০] কিন্তু 'নিজেরা নিজেরা' 'কী' করতে হবে সেটা বড় নেতার নাম করে জানিয়ে দিয়ে যায় উদয়ই। না করলে পার্টি যে 'ভালোমন্দ'র দায়িত্ব নিতে পারবে না সেকথাও স্পষ্টই বলে। এই প্রচ্ছন্ন হুমকি যে সমকালীন গ্রামজীবনের বাস্তব সত্য তা দেখাতে ভোলেন নি মনোজ মিত্র। যে নদুকে ধনগোপালের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল উদয়, সে নদুই যখন রথ-উৎসবের ম্যানেজার হয়ে ধনগোপালের বর্গাদারের ওপর অত্যাচার করেছে তখন উদয় সম্পূর্ণ দায় ঝেড়ে ফেলে দায়ী করেছে ধনগোপালকেই। রাজনীতিকের প্রকৃত চরিত্র এটাই। কিন্তুকে বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে দিতে নিজেই ভয় পান মনোজ মিত্র। তাই নিচুতলার কর্মী উদয়ের মধ্যে যে অবক্ষয় দেখেন তা থেকে মুক্ত রাখেন নেতা প্রফুল্লবাবুকে। উদয় 'প্রফুল্লবাবুর নাম ভাঙিয়ে মোড়লি করে বেড়াচ্ছে' বা উদয়রা এমন অনেক কাজ করে 'যাতে প্রফুল্লবাবুর সায় নেই। অনেক সময় তিনি জানতেও পারেন না।' প্রভৃতি উক্তির মধ্য দিয়ে নিজেই আশ্বস্ত হতে চান যে, পচন তখনো সর্বস্তরে ধরেনি।

নাটকের শেষে মনোজ মিত্র দেখান সামাজিক বিবর্তনের স্বরূপটি। জগন্নাথের যে রথ ছিল পরিবারের সম্পত্তি, সেই রথ গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে ধনগোপাল পারিবারিক উৎসবকে সামাজিক উৎসবে রূপান্তরিত করলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের শোভাযাত্রায় পা ফেলতে প্রস্তুত হয়েছেন ধনগোপাল।এই পরিণতিকে 'লক্ষ্যের সরণী'তে পৌঁছনো বলে চিহ্নিত করেছেন সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ

> '' 'শোভাযাত্রা' মানুষের সর্বজনীন শোভাযাত্রা হয়ে উঠেছে। জমিদার বংশের নিজস্ব রথযাত্রা সব মানুষের রথযাত্রায় পরিণত হয়। ধনগোপাল এবং তার পরিবারও বাইরে থাকতে পারেন না এই জীবনস্রোতের। তথাকথিত বংশগৌরব আর অতীতের জন্য হা-হুতাশ মুছে যায় কালের অভিঘাতে। শ্রীমিত্র এখানে অসাধারণ প্রজ্ঞায় বলে দেন, ইতিহাসের অমোঘ বিধানে কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহে একাকার হয়ে যায় সমস্ত জমিদার পরিবারের আজকের বংশধরেরা।''[৪১]

এই নাটক তাই কেবল ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আটকে থাকে না, হয়ে ওঠে সমাজের ভাঙন ও নতুন সমাজের নির্মাণের কাহিনি।

'দর্পণে শরৎশশী'(১৯৯১) নাটকে একশ বছর আগেকার গ্রামীণ বাংলাদেশের সমাজকে মনোজ মিত্র উপস্থাপিত করলেন স্নিগ্ধ মায়াময় প্রকৃতি, থিয়েটার-চেতনা এবং সবরকম সামাজিক কলুষসহ। কপোতাক্ষ তীরে পাঁচক্ষীরের জমিদারবাড়িতে থিয়েটারের আয়োজনকে

কেন্দ্র করে সমকালীন সমাজকে দ্রুত একবার জরিপ করে নিয়েছেন নাট্যকার। সেই সমাজে দেখেছেন কুঞ্জবিহারীর মতো কেজো জগতে অচল কিন্তু দিলখোলা মানুষ, দেখেছেন থিয়েটারপ্রেমী ইন্দ্রনাথ, কামুক গুরুচরণ, থিয়েটারের অভিনেত্রী মনোরমা, নতুন অভিনয় করতে আসা হাসু, থিয়েটারে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করা তুফান প্রভৃতি অসংখ্য বাস্তব চরিত্র। তিনি দেখিয়েছেন, থিয়েটার যুগে যুগে মানুষকে শিখিয়েছে প্রতিবাদী হতে, বিদ্রোহী হতে। সমাজচ্যুত সিতিকণ্ঠকে তাই মঞ্চে উঠিয়েছে ইন্দ্রনাথ। কিন্তু সমাজ চিরকালই নিজের জোর দেখিয়েছে – সোজা পথে ব্যর্থ হলে বাঁকা পথে। তাই থিয়েটারের আসর লণ্ডভণ্ড করে কে বা কারা মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যেভাবে ধ্বস্ত হ'ত কিনু কাহারের থিয়েটার, যেভাবে একালে গায়ের জোরে বন্ধ করে দেওয়া হয় বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের অপছন্দের নাটকের অভিনয়, সেভাবেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পাঁচক্ষীরের জমিদারবাড়িতে 'নীলদর্পণ'-এর সেই অভিনয়।

'গল্প হেকিমসাহেব'(১৯৯২-৯৩) নাটকে মনোজ মিত্র আরো পিছিয়ে গিয়ে ধরলেন দেড়শ বছর আগেকার সমাজকে – যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তালুকদার-তহশিলদারদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে হেকিমসাহেবের যে কাহিনি বয়ন করলেন, তা হয়ে উঠল সমকালীন সমাজেরই রূপক, হয়ে উঠল আর এক ব্যবহৃত মানুষের কাহিনি। ব্যবহৃত ঘন্টাকর্ণ ছিল অশিক্ষিত, বোকা। কিন্তু এই নাটকে মনোজ মিত্র দেখালেন, ব্যবহৃত হবার হাত থেকে বুদ্ধিজীবীরও নিস্তার নেই। মধ্যস্বত্বভোগী দুই তালুকদারের লড়াইয়ে দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হয় শিক্ষক-অধ্যাপক-চিকিৎসক-শিল্পী। এই ব্যবহৃত হবার চিরন্তনতার কথাই নাটকটিতে আবিষ্কার করেছেন সমালোচক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হেকিমকে 'অগ্রগতির রুদ্ধ দরজার সামনে নিষ্ফল করাঘাতরত ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিনিধি' বলে মনে করেছেন। ভগীরথ মিশ্র এই নাটকের রূপক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, হেকিমের চিকিৎসা হ'ল 'সুবিদ্যা', যা সুগন্ধী ফুলের মতো। ফুল যেমন একজনের বাগানের সার-জলে বিকশিত হলেও সুগন্ধ দেয় সবাইকে, সুবিদ্যাও তেমনি সকলকে শুশ্রূষা দেয়, কিন্তু শোষকশ্রেণি এই সুবিদ্যাকে ব্যবহার করতে চায় নিজের শোষণের প্রয়োজনে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যা শোষণের সহায়ক ততক্ষণই বিদ্যা এবং বিদ্বানের কদর। কিন্তু বিদ্যা নিজের গুণেই চেতনা সঞ্চার করে বিদ্যা-ধারকের মনে। সেই চেতনা যখনই সে সঞ্চারিত করতে যায় তখনই কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে, যেমন বেঁধেছে হেকিমের সঙ্গে। সে জানত, রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা বেশি জরুরি। তাই পলাশপুরের প্রজাদের বলেছিল খাজনা বন্ধ করে দীঘি কাটানোর কথা। গরিব মানুষের মধ্যে চেতনা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল বলেই দরিয়াগঞ্জ বা পলাশপুর কোথাও ঠাঁই হয় নি তার। কারণ ঃ ''শাসক ও মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায় চিরকালই শোষক চরিত্র বহন করে। জনগণ সচেতন হোক এটা কখনই তাদের কাম্য নয়। যিনি সেই সচেতন করায় উদ্যোগী হবেন তার কপালে কোপ পড়বে।''[৪২] অর্থাৎ এই সময় নিজের চারপাশে মনোজ মিত্র দেখছেন উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে স্থানীয় মেধার অপচয়, দেখছেন সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টা এবং মানুষকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। কিন্তু নাটকে সেই কথাগুলি বলছেন রূপকের আবরণে, সময়ের ব্যবধান রচনা করে। তবে সে রূপক সহজভেদ্য। তাই ঃ

> ''দর্শক লক্ষ্য করতে থাকেন তাঁর সমকালকে। কুষ্ঠ তখন আর কোনও দেহের ব্যাধি নয়, যেন সমাজেরই ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। লাঠিয়াল আর বাঈজী – প্রতাপের দুই পদ্ধতি যে অন্যরূপে প্রকাশ পায় একালেও, এই বোধ ক্রমে বিপন্ন করে তোলে তার অস্তিত্ব। ... অন্তর্বয়নে ভেসে ওঠে অন্যতর আখ্যান।''[৪৩]

সে আখ্যান চিনিয়ে দেয় আমাদেরই পরিচিত প্রতিবেশকে। রূপকের আবরণ ঘুচে গিয়ে এক বিন্দুতে এসে দাঁড়ায় অতীত আর বর্তমান। শোষণ এবং অত্যাচারের সূত্রে বাঁধা পড়ে সেকাল থেকে একাল ঃ ''বোঝা যায়, প্রাচীন লোককাহিনির আদলে মনোজ মিত্র স্পর্শ করেছেন বর্তমানেরই এক নিষ্ঠুর বাস্তবকে, যার একদিকে আছে সামাজিক দায়বোধ ও আদর্শবোধের অঙ্গীকার, অন্যদিকে ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক রেষারেষিতে সেই অঙ্গীকারের অপমৃত্যু।''[৪৪] ব্যবহৃত মানুষের বিষণ্ন আখ্যানের শেষেও মনোজ মিত্র বললেন ছায়েম আর গঙ্গামণির কথা। দেখালেন ছায়েমরা তাদের মতো করে প্রতিবাদ করে। তালুকদারের ব্যাধির কথা শুনে লুকনো পুঁথি বের না করে দিয়ে হেকিমের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। এই প্রতিবাদ, এই প্রতিশোধ অভিজাত নয় কিন্তু চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মনোজ মিত্র ভরসা রাখেন এই মানুষের ওপরই, ইঙ্গিত দেন, এদের দ্বারাই রক্ষিত হবে 'সুবিদ্যা'।

'আত্মগোপন'(১৯৯৪) নাটকেও ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে সেই ব্যবহৃত মানুষের কথাই বললেন মনোজ মিত্র। ব্যবহারকারী এখানে বাইরের কোনো শক্তি নয়, বরং মানুষেরই ভেতরকার লোভ এবং অপরিমেয় উচ্চাশা। সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে যে সর্বব্যাপী অবক্ষয় বেদনার্ত করেছে মনোজ মিত্রকে,তারই একটি রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন খেলার মাঠকে কেন্দ্র করে। অবাক হয়ে দেখেছেন, গণিকার মতো সবাই হাপসে মরছে 'দর' পাবার জন্য। গোটা সমাজটাই এখানে নাট্যকারের দৃষ্টিতে বেশ্যালয়। কে কত অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হবে, তারই নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা চলছে। দুনিয়াজুড়ে বাজারই যেন একমাত্র সত্য – স্নেহ-মায়া-মমতা, সম্পর্ক ইত্যাদি সবই তুচ্ছ বাজারের কাছে। ভুবনায়নের এই অশুভ দিকটিকে দেখিয়েও মনোজ মিত্র শেষপর্যন্ত পতনোন্মুখ নায়কের দিকে বাড়িয়ে দেন ঘনিষ্ঠজনেদের সহযোগিতার হাত। বাজারের উর্ধ্বে স্থান দেন মানবিক সম্পর্ককে। দশ বছর পর লেখা 'রঙের হাট' (২০০৪) নাটকে বিশ্বজোড়া বাজারেরই আরো বিস্তৃত রূপ ধরা পড়েছে। বিশ্বায়নের ফলে খুচরো ব্যবসাকে যে গিলে খেতে চাইছে বৃহৎ পুঁজি, সেদিকেও আকৃষ্ট হয়েছে মনোজ মিত্রের বিচিত্রগামী দৃষ্টি ঃ ''সত্যি চাচা ! দুনিয়ায় ছোট ব্যবসায়ীর আর ঠাঁই নেই গো! রাঘব বোয়ালেরা সব গিলে খাবে। কিরকম যেন মনে হয়, কারা যেন কোথায় বসে কলকাঠি নাড়ছে , ইচ্ছেমতো তুলছে, ফেলছে, আমাদের সব বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে গো!''[৪৫] এই বৃহৎ পুঁজির দ্বারাই নির্ধারিত হয় বাজারমূল্য। কে কত দামে বিকোচ্ছে তার ওপরই তার মাহাত্ম্য। বাজারসর্বস্ব এই দুনিয়ায় সকলেই নিজের দর যাচাই করছে এবং সর্বোচ্চ দরের মুহূর্তটিকে ধরতে চেষ্টা করছে। আগ্রাসী এই বাজারের বিরুদ্ধে মনোজ মিত্র জারি রাখেন নিজের লড়াই। সে লড়াইয়ে তাঁর অস্ত্র সেই চিরন্তন স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা। যুগ যতই বদলে যাক, সময় যতই ক্ষুব্ধ হোক, মানুষের জীবনে এইসব মৌল বৃত্তিগুলির প্রভাব

কোনোদিন শেষ হয়ে যেতে পারে না বলেই বিশ্বাস করেন তিনি।

সাধারণ মানুষের যে ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে, তাকেই আবার তুলে ধরলেন 'দেবী সর্পমস্তা'(১৯৯৫) এবং 'ছায়ার প্রাসাদ'(১৯৯৭-৯৮) নাটকে। দুটি নাটকই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত। প্রথমটির অবলম্বন কাল্পনিক ইতিহাস এবং দ্বিতীয়টির আশ্রয় ইতিহাসের সম্ভাব্যতা। 'দেবী সর্পমস্তা'য় রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপের বংশ, রাজ্য এবং সিংহাসন রক্ষায় আদিম বনচারী মানুষের ভূমিকা দেখিয়ে মনোজ মিত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসের চিরন্তন সত্য। এই বন-পাহাড়, এই আদিম মানুষ যুগে যুগে শাসকের 'শক্তির ভাণ্ডার' রূপে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ, ভারতবর্ষের কোনো শাসক কোনোদিন এই মানুষগুলিকে আপন বলে কাছে টেনে নেয় নি, তাদের দু:খ-দুর্দশা মোচনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি। সভ্যতার মূল স্রোতের সঙ্গে এদের যোগ স্থাপিত হয় নি। জমেছে বঞ্চনার পাহাড়। উন্নয়নের নামে যখন একালে আদিবাসী মানুষকে স্ব-ভূমি থেকে উৎখাত হতে হয়, বঞ্চনার কথা বললে জোটে দমন-পীড়ন, তখন মনোজ মিত্রের এই নাটকে ভর পেয়ে যায় সমকাল। নির্মোহ বিশ্লেষণে নাট্যকার দেখিয়ে দেন : ''অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে/দেনা শোধবার ভার আমাদের পরে।''[৪৬]

'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকে শূদ্রদের ওপর উচ্চবর্ণের দীর্ঘদিনের অত্যাচারের পরিচয় আছে। শূদ্রের কোনো কিছুতে কোনো অধিকার নেই :

> ''তুদের বলে কিছু নাই। জল না ভূমি না ঝর্ণা না জোছনা না ... কিছুতে শূদ্দুরের কোনো অধিকার নাই ... ঝপাং করে ঝাঁপাই দিলি ঝর্ণায়! ঘন্টা বাজে নাই কেনে? অচ্ছুৎ অনার্যদের গলায় ঘন্টাগুলো বাঁধা হৈছে কেন? চলতে ফিরতে ঢং ঢং বাজবে, আমরা ছুঁয়া বাঁচাই সরে পড়বো।''[৪৭]

যে শূদ্রাণীকে বাইরে স্পর্শ নিষেধ, সেই শূদ্রাণীকেই ভোগে কোনো নিষেধ নেই। 'শূদ্দুরের মেয়ে'দের আজ নয় তো কাল যেতেই হবে উচ্চবর্ণের প্রভুদের ভোগে। ভোগের তাড়নাতেই কুসংস্কারকে ব্যবহার করে 'অশুভ' বলে দেগে দেওয়া হয় নারীকে। এই কাহিনিকে মনোজ মিত্র স্থাপন করেছেন বিন্দুসারের রাজত্বকালের পটভূমিতে। কিন্তু আজকের 'আধুনিক' ভারতেও বিষয়গুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। এ যেন আসলে বর্তমানকেই দেখা, কিন্তু ইতিহাসের দূরত্বে স্থাপন করে। মনোজ মিত্র দেখেছেন বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও ভারতে আবার প্রবল হচ্ছে জাত-পাতের সমস্যা, মানুষের বর্ণপরিচয়ই হচ্ছে মুখ্য। শাসকেরা নিজেই কুসংস্কারে আবদ্ধ, সুতরাং সংস্কারমুক্তি সুদূর-পরাহত। ক্ষৌণি যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় বিন্দুসারকে প্রভাবিত করেছে তা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ধর্মীয় প্রভাবকেই মনে করায়। সেই সমকালই চিত্রিত হয়েছে নাটকে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> ''নাটকে উপস্থাপিত নানা বিষয়ে আমাদের সমকালকে আমরা চিনে নিতে পারি – স্বৈরাচার, অপশাসন, গুপ্তচর ও ঘাতকসমেত পুলিশরাজ, রাজনীতির ধর্মীয় নিষ্ক্রণ, দুর্নীতি, কুসংস্কার, জাতপাতের সমস্যা, দলিত জাগরণ, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশে সরকারি বাধা, নারীর অবমাননা, ডাইনি বানিয়ে নির্যাতন ইত্যাদি।''[৪৮]

কিন্তু এখানেও মনোজ মিত্র আস্থা স্থাপন করেছেন দ্বৈপায়নের মতো সাধারণ মানুষের ওপর। তাই রাজার পরিত্যক্ত শিশুকে , প্রিয়দর্শী অশোককে গ্রহণ করতে যান দ্বৈপায়ন ঠাকুর । কিন্তু সুভদ্রাঙ্গী প্রিয়দর্শীকে নিয়ে প্রস্তুত হয় লড়াইয়ের জন্য । মানুষকে 'পিশাচ' বানিয়ে রাষ্ট্রের খেলা সে বন্ধ করবে । অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার উপশমে অশোকের মতো একজন প্রজাকল্যাণকামী শাসকের আবির্ভাব আকাঙ্ক্ষা করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র ।

'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯) মূলত একজন অদ্ভুত ভাবনার মানুষের গল্প । কিন্তু সেখানেও ভেতরে রয়েছে নতুন সামাজিক বিন্যাসের কথা । শহরে আর জমি নেই, তাই ভানু খেমকার মতো প্রমোটারদের দৃষ্টি পড়েছে গ্রামের দিকে । সেখানে 'ন্যাচারাল বিউটি'র মাঝে পাঁচতারা হোটেল বানিয়ে বার-রেস্তোরাঁ-বোটিং-ক্যাসিনো আর সেইসঙ্গে হনুমানজীর মন্দির তৈরি করতে পারলেই দুরন্ত ব্যবসা। মনোজ মিত্র বলতে চান, ধর্ম এখন পাঁচতারা হোটেলেরও অনুষঙ্গ। যাই করা হোক না কেন, সঙ্গে চাই ধর্ম । রেলের কামরায় ডাকাতি, তাও নাঙ্গাবাবার ছদ্মবেশে । গ্রাম বাংলায় আধুনিকতার এই অশুভ প্রসার মনোজ মিত্র চান না । নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যর্থ করেছেন ভানু খেমকার প্রয়াস, গন্ধকালীকে দিয়ে রূপচাঁদ ওরফে নন্তু হালদারের ফুলবাড়ি গ্রামের বাড়িটাকে রক্ষা করেছেন প্রমোটারের গ্রাস থেকে । সমাজসচেতনতা অত্যন্ত তীব্র বলেই মনোজ মিত্রের এই নাটকে উঠে এসেছে বিশ্ব বাণিজ্যে আমেরিকার খবরদারি, অসহায় শিক্ষকের মূল্যবোধের বিনষ্টি প্রভৃতি সাধারণ সামাজিক সত্য। বেদনার্ত চিত্তে মনোজ মিত্র লক্ষ্য করেছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হয়েছেন পাঁঠা-খাসির সাপ্লায়ার। সেই অবনমনের কথা যখন তিনি নিজে মুখে বলেন তখন কৌতুক আর বিষাদ একাকার হয়ে যায় ঃ

> ''ইয়েস টিচার থেকে বুচার ! টিটকিরি দিয়ো না মা, ডেভলপিং কানট্রি ... আমাদের হ'ল উন্নয়নশীল দেশ ... রিটায়ার্ড মাস্টারের পেনশন আটকে রেখে নিশ্চয়ই দেশের অন্য অন্য উন্নয়নের খাতে লগ্নি করা হচ্ছে । সেটাও খুব জরুরি । কী আছে, এককালে গুড সিটিজেন সাপ্লাই করেছি ... এখন করছি গুড খাসি-পাঁঠা । অল দি সেম।''[৪৯]

'গুড সিটিজেন' আর খাসি-পাঁঠাকে 'অল দি সেম' বলে মনোজ মিত্র তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করেন সেই মানুষগুলির প্রতি, যারা একদা ছাত্র ছিল এবং কর্মক্ষেত্রে যারা শিক্ষকের পেনশন আটকে রাখছে। শিক্ষকদের পেনশন নিয়ে এই দীর্ঘসূত্রিতা সমকালের পশ্চিমবঙ্গের একটি জ্বলন্ত সমস্যা । সেই সমস্যাটিকে এখানে চিহ্নিত করেছেন মনোজ মিত্র। যে আধুনিকতা ক্যাবারে ডান্সের আসর আর ক্যাসিনো বসিয়ে নষ্ট করতে চায় গ্রামের সরলতা ও স্নিগ্ধতা, সেই আধুনিকতার বিরুদ্ধে মনোজ মিত্র লড়াইয়ে নামান গন্ধকালীর মতো চরিত্রদের । নাট্যিক শর্ত রক্ষা করে তাদের জয়ও দেখান । সংরক্ষণের জোরে গ্রামবাংলায় নারীর যে ক্ষমতায়ন ঘটেছে, সেই বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন এই নাটকে।

২০০০ সালে লেখা 'নাকছাবিটা' নাটকে মনোজ মিত্র ধরেছেন পঞ্চাশ বছর আগেকার অর্থাৎ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সমাজকে । একসময় যারা ছিল জমিদার-জোতদার, নতুন

কালে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার জন্য তাদের উদগ্র বাসনা । কারণ 'পাওয়ার'-এ তারা অভ্যস্ত। নতুন যুগের 'পাওয়ার সেন্টার' মন্ত্রিসভায় ঢুকতে তারা মরিয়া । সেজন্য যে কোনো পথ নিতে প্রস্তুত। তাই মানুষের ভোট দেবার ওপর নির্ভর করে বসে না থেকে তারা 'ভোট করান' । মনোজ মিত্র অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন, জমিদারি রক্ষা করার জন্য ইংরেজ-বিরোধী যে পুত্রকে ত্যজ্য করেছিলেন, নতুন যুগে সেই পুত্রের ইংরেজ-বিরোধিতার গৌরবকে পুঁজি করেই ভোট-বৈতরণী পেরোতে চান বরদাপ্রসন্ন । এই বরদাপ্রসন্নদের স্বরূপ উন্মোচন করেছে মনোজ মিত্রের চরিত্র কাব্যতীর্থ ঃ ''পরাধীন দ্যাশে যারা আছিল স্বাধীনতার বিরোধী অহন তারাই হইছে স্বাধীন দ্যাশের গার্ডিয়ান ।''[৫০] বীরেশ্বর ছিল সহিংস বিপ্লবী । আদর্শকে সে আঁকড়ে থেকেছে । জেল থেকে যখন ছাড়া পেয়েছে তখন তার শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে । বেরিয়ে সে দেখেছে সমাজ অনেক বদলে গেছে । যেসব পুলিশ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, স্বাধীনতার পর তারাও আখের গুছিয়ে নিয়েছে । এই নতুন সমাজে বীরেশ্বরদের অদর্শবাদ অচল । এই আধুনিককালে স্বার্থই মুখ্য । নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি তমালের কাছে তাই বীরেশ্বরের জোটে ভর্ৎসনা ঃ

> ''আশ্চর্য লোক আপনি । কবেকার কোন বিবাদ আজও ধরে বসে আছেন! একটা সামান্য ব্যাপার কচলে কচলে এমন জটিলতা সৃষ্টি করেছেন ... নিজেও ভুগছেন, বাড়ির সবাইকেই ভোগাচ্ছেন ... নুকুকে নেব যদি ... রায়বাহাদুরের হাত থেকেই নেব। জীবনে যেটুকু যা পেয়েছি, ওই মানুষটির কাছ থেকেই । ওঁর স্কলারশিপের টাকায় আমার ডাক্তারি পড়া । ... আমাদের পরিবারের ছেলে কখনো বিদেশ যাবার কথা ভাবতেই পারে না । ... যদি হয়, ওঁর জন্যই হবে , কেরিয়ারটা নষ্ট করতে পারব না।''[৫১]

এই কেরিয়ারসর্বস্ব প্রজন্মের ভাবনা বুঝতে পারে না বীরেশ্বর, বুঝতে পারেন না তার স্রষ্টা মনোজ মিত্রও । আধুনিক সমাজের, আধুনিক প্রজন্মের সময় নেই পুরনোকে আঁকড়ে থাকার। প্রতি মুহূর্তে সেখানে এগিয়ে যাবার লড়াই। সেই লড়াইয়ে আদর্শ নয়, প্রয়োজনের দাবীই প্রধান । কিন্তু নতুন যুগেও মনোজ মিত্রের বীরেশ্বররা থেকে যায় আদর্শকে অবলম্বন করেই। কারণ নতুন ভাবনায় দেশকে, সমাজকে প্রতারণা করতে তারা পারে না । সব কাল এবং সমাজের প্রেক্ষাপটেই মনোজ মিত্র তাদের বাঁচিয়ে রাখেন । সেখান থেকেই নতুন সদর্থক সম্ভাবনার বিকাশ আশা করেন ।

'কুহুযামিনী' (২০০৫) নাটকে মনোজ মিত্র আবার আক্রমণ করেন ধর্মীয় ভণ্ডামিকে। গুঁইবাবা, দাড়িবাবা, মৌনীবাবা, বাঁকাশশী-দেরই উত্তর-মানুষ এলোকেশী, যে কিনা ছিল 'রুটি-তড়কাওয়ালী', আর হয়েছে 'মা বাঁকেশ্বরীর সেবিকা'। তড়কাওয়ালীকে পুলিশ লাঠি মেরে ওঠাতে পারে কিন্তু মন্দিরের পরিচালিকাকে ওঠাবে কি করে ! ধর্মস্থানে হাত দেবার সাধ্য কোনো পুলিশেরই নেই । তাই এলোকেশী নি:শঙ্ক । ব্যঙ্গনিপুণ মনোজ মিত্র এলোকেশীকে দিয়ে বলিয়ে নেন ঃ ''আমার থিয়োরিতে বলে, জাতীয় সড়কের দুধারে মঠমন্দির দরগা মাজার থাকবে থরে থরে সাজানো, তবে না জাতির অগ্রগতি !''[৫২] কেবল ধর্মীয় ভণ্ডামি নয়, রাজনীতিকরা কোনো না কোনোভাবে আলোচিত হতে চান, জনতার নজরে থাকতে চান -

– তা সে পুলিশকে ধমকে হোক বা নিজে জেলে গিয়ে হোক ! রাজনৈতিক নেতাটি কোন দলের তা স্পষ্ট করেন না নাট্যকার, তবে 'সর্বভারতীয় ছাতা'র ইঙ্গিতে কংগ্রেস বলেই মনে হয় । কিন্তু বিশেষ কোনো দল নয়, সাধারণভাবে রাজনীতির শঠতা এবং ব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধেই মনোজ মিত্রের লড়াই । তাই তিনি দেখান, পশ্চিমবঙ্গে বহু-আলোচিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষকে কোনো না কোনোভাবে কিছু পাইয়ে দেবার উপায়। নেপুর ঠাকুমার সংলাপে সেই পাইয়ে দেবার ব্যবস্থার কথাই উল্লেখিত ঃ

> ''আরে শোন না দুদু, পেত্থমে কম্বল চাইলুম, দিলে না ... মৌমাছি চাষের এককালীন চাইলুম, দিলে না ... দুনিয়ার নোককে ইংলিশ বাথনুম বানাবার টাকা দিচ্ছে ... আমার বেলায় বলে, অত মাঠ জংগল পড়ে আছে, যাও বুড়ি বাংলা বাথনুমে যাও ... এবার হাঁসের বেলা আর ছাড়ি । পঞ্চেৎ হয়েছ, টাটকা ভোটটা নিয়েছ, এট্টা কিছু তো দেবে বাছা!''[৫৩]

এই পাইয়ে দেবার ফলেই মানুষ ক্রমশ লোভী হয়েছে, সুযোগসন্ধানী হয়েছে । দেশের মানুষের এই চূড়ান্ত অবনমনকে 'রসিক লাঠিয়াল'-এর মতো আঘাত করেন মনোজ মিত্র ঃ ''ওই শোনো আলুর হিমঘরে সমবেত পল্লীবাসীর মুখে এক প্রশ্ন, হোয়াই নেপুর ঠাকুমা, হোয়াই নট আমি! ভারতবর্ষ জুড়ে আজ এক আওয়াজ হোয়াই আদারস্, হোয়াই নট আমি! সবাই খাচ্ছে, আমি কেন খাব না?''[৫৪] 'পালিয়ে বেড়ায়', 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার', 'কুহুযামিনী','অপারেশন ভোমরাগড়', 'ব্রিজের ওপর বাপি' প্রভৃতি নাটকে সাধারণভাবে সমাজ-রাজনীতির সমালোচনা বহুবার করেছেন মনোজ মিত্র । কিন্তু এসব নাটকে বাস্তব অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন থাকলেও তা থেকে উত্তরণের স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই । কোথাও ব্যক্তিমানুষের বিষাদ বা আনন্দ, কোথাও শুভবোধের জাগরণ, কোথাও বা রূপকথার ধরণে নাটক শেষ করেছেন । সামাজিক সমস্যার পরিবর্তে এসব নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তিমানুষের জীবন । যেমন 'ব্রিজের ওপর বাপি' নাটকে পুলিশ অফিসার বাপি মান্না পড়েছে এক প্রতিকূল সামাজিক অবস্থায় । রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে সে অসহায়, অর্থের কাছে সে পরাজিত । নিজের 'না-মেয়ে-না-ছেলে'র সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে ছাতিম সরকার। রাজনীতিক তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে সে কিছুই করতে পারে না । কারণ পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট শহরটাতে তারকেশ্বরই সর্বেসর্বা । অসহায় বাপিকে শুনতে হয়েছে তারকেশ্বরের সদম্ভ উক্তি ঃ ''আমি অবাক হয়ে দেখছি, আমার শহরে আমার থানার আমার অফিসার আমার কলেজের আমারই অধ্যাপিকার নামে একটা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে আমার ছেলেকে কিভাবে নির্যাতন করছে।''[৫৫] এই সর্বনাশা দলতান্ত্রিকতা সময়কে নষ্ট করে, ভ্রষ্ট করে । সেই নষ্ট সময়ে মানুষ হয়ে যায় ক্লীব – তার কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না । সেই অবস্থাতেই জাগে আত্মহত্যার বাসনা । মনোজ মিত্র শেষ পর্যন্ত বাপিকে জীবনের কাছে ফিরিয়ে আনেন ঠিকই, কিন্তু নষ্ট সময় নিয়ে তাঁর হতাশা তাতে চাপা থাকে না । আসলে এইসময় স্থবির, আত্মসুখসর্বস্ব এক সমাজে মানুষের অবস্থান । কোথাও কোনো আলোড়ন নেই, সব আপাত-শান্ত। কিন্তু যাঁরা সূক্ষ্ম চিন্তার মানুষ, sensative মানুষ – তাঁরা এই সমাজে অসহায় । সেই অসহায়তা ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র, কিন্তু তা থেকে মুক্তির

স্পষ্ট কোনো দিশা এই পর্যায়ে দেখাতে পারেন নি ।

২০০৫ সালে লেখা 'যা নেই ভারতে' নাটকে বরং মনোজ মিত্রের সমাজচেতনা অনেক তীক্ষ্ন। মহান গ্রন্থ মহাভারতের অকথিত দিকগুলিতে আলো ফেলে তিনি যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যুগপ্রচলিত ধারণার বিপরীত সত্যকে। মহাভরতের মহান ভাবকে তিনি ধ্বস্ত করে দিয়েছেন। নতুন কালের নতুন দৃষ্টিতে পুরাণকে দেখতে গিয়ে ভীষ্মকে আবিষ্কার করেছেন আধুনিক যুগের যুদ্ধবাজ রাজনীতিক হিসেবে। আর চিরনিন্দিত ধৃতরাষ্ট্রকে দেখেছেন শান্তিকামী হিসেবে। ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র এই নাটকে দুই বিপরীত মতাদর্শের প্রতিনিধি — সেই দুই মতাদর্শের দ্বন্দ্বই নাটকের উপজীব্য। কঞ্চুকীর টিপ্পনীর মধ্য দিয়ে ভীষ্মের মহান গাম্ভীর্য খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সাম্রাজ্যলোভী, প্রভুত্বকামী এক মানুষ। কঞ্চুকীর দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছে ত্যাগীর ছদ্মবেশে ভীষ্মের আসল রূপ ঃ "সত্যি বলতে কি, রাজা না হয়েও তুমি যতকাল রাজত্ব করলে, এতটা কিন্তু রাজা হয়েও লোকে করে উঠতে পারত না।"[৫৬] কুরুবংশ চিরকাল হরণ এবং লুণ্ঠন করেছে। ধৃতরাষ্ট্র সেই ধারাটিকে বদলে দিতে চায়। স্বপ্ন দেখে এক শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর — যে পৃথিবীতে যুদ্ধ থাকবে না, বর্ণভেদ থাকবে না। তাই সে চায় না অশ্বমেধ, চায় না পররাজ্যে ঢুকে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যে ভীষ্ম রাজত্বও করেন না, সংসারও করেন না, তিনি অস্ত্রচালনা ছাড়া আর কী পারবেন। তাই তাঁর চাই যুদ্ধের আয়োজন, লুণ্ঠনের আয়োজন। ঐশ্বর্য রক্ষা করতে হবে, সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে — তাই ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তে যুদ্ধবাজ পান্ডুকে সিংহাসনে বসান ভীষ্ম। এর ফলে রাজত্ব পরিচালনায় তার নিজের মত প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম পান্ডু সিংহাসন ত্যাগ করে স্ত্রী-দের নিয়ে বনবাসে গেলে সিংহাসনে বসতে হয় ধৃতরাষ্ট্রকে। এদিকে পিতার রাজ্য আক্রমণের প্রতিবাদে গান্ধারী নিজের জরায়ু বিনষ্ট করে কুরুবংশকে নির্বংশ করতে চায়। কিন্তু উত্তরাধিকারী তো চাই, লুণ্ঠিত সাম্রাজ্য ভোগ করার লোক চাই। বংশপরম্পরায় ভোগের আয়োজন করা চাই। তাই বনবাসে মৃত পান্ডুর পাঁচ সন্তানরূপে কুরুপুরে গৃহীত হয় পাঁচ বালক। এই বালকেরা সত্যিই পান্ডুর সন্তান কিনা সে সংশয় জাগিয়ে তোলেন মনোজ মিত্র নিপুণ যুক্তিজালে। ধৃতরাষ্ট্র কেড়ে নিচ্ছে পেশিশক্তি ও অস্ত্রশক্তির গৌরব, তাই পঞ্চ পাণ্ডবকে নিয়ে এসে সেই গৌরব পুনরর্জনের চেষ্টা। চরম দ্বন্দ্ব সমাগত। এ দ্বন্দ্ব কেবল সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে নয়, এ দ্বন্দ্ব দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দর্শনের। শকুনির সংলাপে এই দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করেছেন মনোজ মিত্র ঃ "একদিকে দেশব্যাপী অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার ফিরিয়ে আনা আর একদিকে তোমার স্বামীর প্রতিরোধের সঙ্কল্প। শ্যেনপক্ষী আর কবুতরের লড়াই।"[৫৭] ভীষ্ম হলেন যুদ্ধপ্রিয় শ্যেনপক্ষী, ধৃতরাষ্ট্র শান্তির দূত কবুতর। নাট্যকার দেখাতে চান, শান্তির জন্য, যুদ্ধবাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যও অস্ত্র ধরতে হয়। ধৃতরাষ্ট্রকেও তাই বাহিনী গড়তে হয়। সে বাহিনী গড়ে ওঠে রাজবাড়ির সেইসব পাপের ফলদের নিয়ে, যাদের মেরে না ফেলে জঙ্গলে বড় করেছে পাতকিনী, যারা সর্বস্ব হারিয়ে অর্জন করেছে পৈশাচিক শক্তি। ব্যাসের অনুমতিক্রমে গান্ধারী দত্তক নিয়েছে সেই শতপুত্র। তারাই 'সাধু আর যোদ্ধার মিলিত চক্র'কে ধ্বংস করার কাজে ধৃতরাষ্ট্রের সহায়। এই শতপুত্র কুরুবংশেরই সন্তান, কিন্তু কুরুবংশের অধিকার তারা

পায়নি। বঞ্চনাবোধ আর ক্ষোভ থেকেই তারা হয়েছে হিংস্র, বর্বর। ধৃতরাষ্ট্র তাদের আহ্বান জানিয়েছে নিজেদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে। এই নাটকে ভারতকাহিনির মধ্যে মনোজ মিত্র সন্নিবিষ্ট করেছেন আধুনিক ভারতের কাহিনি। দীর্ঘকালব্যাপী বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের জাগরণকে তিনি রূপায়িত করছেন মহাভারতীয় পটভূমিতে। 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে বলেছিলেন, প্রান্তিক মানুষকে ভারতবর্ষের শাসক কোনদিন আপন করে নেয়নি। এই নাটকেও বললেন সেই বঞ্চনা এবং অনাদরের কথা। খোঁজ নিতে চাইলেন ক্ষোভের পেছনের কারণগুলির। ফলে 'যা নেই ভারতে' হয়ে দাঁড়াল 'যা আছে ভারতে।' সমকালীন ভারতের সেই পরিচয় প্রসঙ্গ বিশিষ্ট সমালোচক লিখেছেন ঃ

> ''আমাদের চেনা পাণ্ডব ও কৌরবদের জায়গায় আমরা দেখি একদিকে যুদ্ধবাজ রাজনীতিবিদদের সম্মিলিত শক্তি, অন্যদিকে অবহেলিত, বঞ্চিত, অপমানিত, প্রান্তিক মানুষদের ঐক্য। আমাদের চেনা মহাভারতে এসব নেই, কিন্তু আমাদের চেনা দেশ ভারতে এ সবই দেখছি আমরা। মনোজ সমকালীন চেতনার আলো ফেলেছেন নাটকের বিশেষ বিশেষ স্তরে। শুধু জাতীয় স্তরেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিও ছায়া ফেলে।''[৫৮]

একাঙ্ক নাটকগুলিতেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে মনোজ মিত্রের সমাজচেতনার তীব্রতা প্রকাশিত। ১৯৭৬ সালে লেখা 'চোখে আঙুল দাদা' নাটকে তিনি দেখালেন সমাজের এমন এক ছিদ্রান্বেষীকে, যে কিনা কারো কাজেই ভালো কিছু দেখতে পায়না, সবক্ষেত্রেই খুঁত ধরে। যে মানুষদের কাছে নিজের দেশের কোন কিছুই ভালো নয়, যারা পরের ভুল ধরাটাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলে মনে করে — এই নাটকে তাদের পরিচয় দিয়ে নিজের মতো করে শায়েস্তা করেছেন মনোজ মিত্র। এই নাটক নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছিল তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। 'কাকচরিত্র' (১৯৮২) নাটকে সমাজ এবং সেইসঙ্গে পরিবারেও খাঁটি লোকের অভাব মনোজ মিত্রকে পীড়িত করেছে। এই সমাজে প্রত্যেকেই সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র। নায়ক হবার মতো প্রসারতা কারো মধ্যেই নেই। 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার জন্য লেখা 'পাকে বিপাকে' নাটকটিতে তিনি জোতদারের বিরুদ্ধে হাবলা জনার্দনের লড়াই দেখিয়েছেন, কিন্তু সে লড়াই তাত্ত্বিক মতে সংঘটিত হয় নি। জনার্দনের মতো মানুষের পক্ষে যেভাবে লড়াই করা সম্ভব, সেভাবেই সে বাধা দিয়েছে জোতদারকে — বাঁশের খুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে মাচার ওপর জোতদারের গুলিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। মনোজ মিত্র শোষিতের জয় দেখান, কিন্তু তা দেখান এরকম সম্ভাব্য পথে। 'মহাবিদ্যা' (১৯৮৬), 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে' (১৯৮৮), 'টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯১), 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' (১৯৯২), 'চমচমকুমার' (২০০২), 'জয়বাবা হনুনাথ' (২০০৪) প্রভৃতি নাটকে সমাজ-রাজনীতির সাধারণ সমালোচনা আছে। 'মহাবিদ্যা' নাটকে যেমন দেখান, সমাজকে — সমাজের সাধারণ মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে উচুঁতলার মানুষরা তাদের দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নেয়। দেশে বৈদেশিক ঋণের ফাঁস চেপে বসেছে, প্রত্যক্ষ কর বসানো সম্ভব নয় প্রজার বিক্ষোভ এবং বিদেশী শক্তির কুনজরে পড়ার ভয়ে, তাই গোপনে ডাকাতি করতে হয়। তদন্ত ব্যবস্থার অসারতার দিকেও কটাক্ষ আছে এই নাটকে। 'টু-ইন-ওয়ান' নাটকে শাসকের মুখ ও মুখোসের কথা বলেছেন, শিক্ষকের বেতন না পাওয়ার কথা

বলে যেমন পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের রাজত্বকালকে কটাক্ষ করেছেন তেমনি শিক্ষকদের টিউটোরিয়াল-প্রীতির কথা বলে নাটককে সমকালের লগ্ন করে দিয়েছেন। হতাশ মনোজ মিত্র এই পর্বে তাঁর চরিত্রর মুখে বলাচ্ছেন যে, খারাপ না বেশি খারাপ — মানুষকে এখন এ দুইয়ের মধ্যে পছন্দ করতে হচ্ছে। 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' নাটকে স্থবির প্রশাসনের প্রতি কটাক্ষ করেছেন, রাষ্ট্র-পরিচালিত স্বাস্থ্য-শিক্ষা-শিল্পের অধোগতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তীব্র ক্রোধে বলিয়েছেন, মন্ত্রিসভা হ'ল চোর-দস্যু-পকেটমারের পুনর্বাসনের স্থান এবং মন্ত্রিত্ব আসলে প্রকাশ্যে চুরি-ডাকাতি-দস্যুতা। পশ্চিমবঙ্গের সব ক্ষেত্রেই যে প্রবল ইউনিয়নবাজি চলছে, তার প্রতিও কটাক্ষ আছে। লক্ষণীয় যে, এইসব নাটকে মনোজ মিত্র বলেছেন সমকালের কথা, কিন্তু তা বলেছেন রাজা-মন্ত্রি-সেনাপতির কাহিনির আড়ালে। রূপক ব্যবহার করেছেন, যদিও সেই রূপক থেকে অন্তর্নিহিত সত্যে পৌঁছতে কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। আরো লক্ষণীয়, সমস্যার পরিচয় দিলেও তা থেকে উত্তরণের কোন ইঙ্গিত দিতে পারছেন না। কৌতুকের শর নিক্ষেপ করছেন, কিন্তু তা সাধারণীকরণের ফলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে পারছে না। বার্তা খুব স্পষ্ট হচ্ছে না। 'চমচমকুমার' (২০০২) নাটকে বরং প্রত্যক্ষতা অনেক বেশি। ২০০১-এ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্লোগান দিয়েছিলেন 'ডু ইট নাউ', কিন্তু সে স্লোগান কার্যকরী হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্কৃতি ফেরে নি, অফিসটাইমে চেয়ার ফাঁকা থাকার 'ট্র্যাডিশন' ঘোচে নি। মনোজ মিত্র তাই সৃষ্টি করেছেন বাঁদর চমচমকে। অফিস টাইমে চেয়ার ফাঁকা দেখলেই চমচম সেখানে বসে পড়ে আর যার চেয়ারে বসে, পরের বুধবারেই সে মরে যায়। রাজার চেয়ারে বসেছে চমচম, তাই মৃত্যুভয়ে রাজা সিংহাসন ছেড়ে দিতে চান। এই সিংহাসনত্যাগ জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার প্রতীক বলেই মনে হয়। নাটকের শেষে দেখা যাচ্ছে, সিংহাসনে বসছেন লেডিকেনি, তিনি খুবই কাজের লোক। তাঁর ছোঁয়ায় সিংহাসনের পাপ ঘুচে গেছে। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তের যে প্রবল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে ছিল, এই নাটকে যেন তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'জয়বাবা হনুনাথ' (২০০৪) নাটকে লালকৃষ্ণ আদবানির রথযাত্রার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন মনোজ মিত্র। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ কেন্দ্রের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভারতীয় জনতা পার্টি। 'রামরাজ্য' স্থাপন করতে গিয়ে দেশে তারা হনুমানবাহিনী সৃষ্টি করেছেন বলে মনোজ মিত্র মনে করেছেন। হনুদের হাতেই দেশের শাসনভার। আসলে নিজের নিজের বুদ্ধি এবং মেধা অনুসারে রামায়ণে কেউ দেখে রামচন্দ্রের সত্যপালন, প্রজাপালন — আর কেউ দেখে শুধুই হনুমান। তীব্র ক্ষোভে মনোজ মিত্র পন্ডিতকে দিয়ে বলিযেছেন ঃ "রাজা কেন বনে যাবে, ছিঃ! বনই এসে দাঁড়াবে রাজার দুয়োরে। তার বেশি দেরিও নেই। অচিরেই দেখবে সোঁদরবনের জলজঙ্গল ঢুকে পড়ছে রাজবাড়িতে।"[৫৯] হাসপাতাল থেকে শুরু করে সর্বত্রই চলছে হনুদের দাপাদাপি। নাটক শেষ করেন মনোজ মিত্র অদৃষ্টবাদের কথা বলে ঃ "যা করবে আমারে ... তোলা থাকবে তোমারে।"[৬০] স্পষ্ট কোনো পথ দেখতে না পেয়েই এই অদৃষ্ট-নির্ভরতা। এর পাশাপাশি 'প্রভাত ফিরে এসো' (১৯৮৮) বা 'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩) একাঙ্কগুলিতে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের মধ্যে সরলতা, শুভবোধ, সহমর্মিতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। যে মায়া-মমতা-ভালোবাসাকে তিনি জীবনের আশ্রয় বলে জেনেছেন, চারপাশের সমাজে তার ক্রমিক অবনমন তাকে

ব্যথিত করেছে। ঘোর অন্ধকারে যেন ডুবে আছে চারপাশ, তাই প্রভাতকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এই প্রভাত মানুষের ভেতরকার কালিমাকে ধুয়ে দিয়ে তাকে শুদ্ধ করবে। 'সাহেববাগানের সুন্দরী' (১৯৮৯) নাটকে মনোজ মিত্র তারই সৃষ্ট মদনের মতো সুন্দরের সন্ধানী। চারদিকে যখন বারুদের গন্ধ, যখন বোমা-লাঠির আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে অসংখ্য সুন্দর, তখন কাকের দৃষ্টিতে সুন্দরের রক্ষণ করতে চেয়েছেন তিনি, কিন্তু সে রক্ষণ সম্ভব হয়নি। বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়েছে কাকের বকুলবাসর, মেমসাহেবের মূর্তি। কটু বাষ্পে দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে কাক। সমাজে সুন্দরের সন্ধানী, শুভবোধের সন্ধানীদের এভাবে দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে দেখা কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ লক্ষণ নয়, বরং বেশিরভাগ নাটকে সুন্দরের সন্ধান সফল হতেই দেখিয়েছেন তিনি।

সমাজ-সচেতন শিল্পীর পক্ষে কেবল সমাজচিত্র অঙ্কনেই সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয় । নিজের মতো করে তিনি সমাজ-সংকট থেকে মুক্তির পথেরও ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন । মনোজ মিত্র তাঁর প্রথম দিককার নাটকে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের যে সংগ্রাম এবং জয়ের কথা বলেছেন, তা বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ-অনুসারী সংগ্রামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । কিন্তু ক্রমে তাঁর নাটক থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঁচ কমে আসতে থাকে। সমাজচেতনা তাঁর একইরকম তীক্ষ্ম থেকে যায়, কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির বিশ্লেষণে তিনি নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান গ্রহণ করেন। মানুষের ভেতরকার শক্তির উদ্বোধনের কথা বলেন । কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল বা তার সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছে দায়বদ্ধ নন বলে মনোজ মিত্রের সমাজ-সমালোচনা কাউকে তুষ্ট করা বা কারো মুখ ভার করার দিকে তাকিয়ে করা হয় নি । সাদা চোখে তিনি নিজের চারপাশের জগতে যা দেখেছেন, তাকেই তুলে এনেছেন নিজের সৃষ্টিতে। সামাজিক অসঙ্গতির দিকে নিক্ষেপ করেছেন ব্যঙ্গ বা কৌতুকের শর - সে শর কখন কাকে বিদ্ধ করবে তা ভেবে কলম সংযত করেন নি । তবে কখনো কখনো প্রত্যক্ষ আঘাতের রূঢ়তা এড়াতে তিনি ব্যবহার করেছেন রূপকের আঙ্গিক কিংবা ফ্যান্টাসির আবহ । দেব-দেবী, পশু-পাখি প্রভৃতি চরিত্রকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে কিংবা নিজের কালকে ইতিহাসের দূরত্বে স্থাপন করে দেখেছেন। রূপকের আড়াল, প্রতীকের দুরূহতা বা ইতিহাসের দূরত্বকে অতিক্রম করতে সেখানে পাঠক-দর্শককে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না, সহজেই চিনে নেওয়া যায় নিজেদের পারিপার্শ্বিককে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবেই সমাজ-বিশ্লেষণী সূত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তাঁর নাটক । আজও তিনি সমানভাবে interact করে চলেছেন নিজের চারপাশের সমাজের সঙ্গে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ


১) অলীক সুনাট্য রঙ্গে - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - মনোজ মিত্র - সৃষ্টি প্রকাশন - কোলকাতা-০৯, বইমেলা, ২০০১, পৃ.৩২

২) ঐ, পৃ.৩৩

৩) মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগৎ - বিষ্ণু বসু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-অগ্রহায়ণ ১৪০১-এর ভূমিকা

৪) এ এক অনন্য অভিযাত্রা – অশোক মুখোপাধ্যায় – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০-এর ভূমিকা

৫) নাট্যকার মনোজ মিত্র – পবিত্র সরকার – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩-এর ভূমিকা

৬) ঐ

৭) কাল বিহঙ্গ – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪১০

৮) অশ্বত্থামা – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৬১

৯) ঐ, পৃ.৭৭

১০) শিবের অসাধ্যি – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১৯

১১) আমি মদন বলছি – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৫১

১২) Frontier - December 24, 1977

১৩) সাজানো বাগান - অশোক মুখোপাধ্যায়, বারোমাস, জুলাই ১৯৭৮

১৪) সাজানো বাগান – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১

১৫) ঐ, পৃ.৩৮

১৬) ৭৭-এর সমবেত শিল্প ঃ জগন্নাথ-দানসাগর-সাজানো বাগান – নৃপেন্দ্র সাহা – গ্রুপ থিয়েটার, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৭৮

১৭) সাজানো বাগান – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৯

১৮) মেষ ও রাক্ষস – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৬৩

১৯) ঐ, পৃ.৬৬

২০) ঐ, পৃ.৯৪

২১) সুন্দরম্ প্রযোজিত 'মেষ ও রাক্ষস' – নাটমঞ্চ – দর্পণ – ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর ১৯৮০

২২) সুন্দরম্-এর মেষ ও রাক্ষস – শ.র.চ. – আনন্দলোক, ২৫ এপ্রিল ১৯৮১

২৩) মেষ ও রাক্ষস – রানা দাস – দেশ, ২৫ এপ্রিল ১৯৮১

২৪) রাজদর্শন – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১২৮

২৫) 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' সংকলনের মুখবন্ধ – রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় – অপেরা – ৬৫ সূর্যসেন স্ট্রীট, কোলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১২, পৃ.৮

২৬) ঐ

২৭) থিয়েটার যদি পণ্যের চেহারা নেয় তাতে ক্ষতিটা কী ঃ মনোজ মিত্র – শৈবাল বিশ্বাসকে দেওয়া মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎ কার - প্রতিদিন - ৮ অক্টোবর ১৯৯২

২৮) 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' সংকলনের মুখবন্ধ – রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ.৭

২৯) কেনারাম বেচারাম – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১৫১

৩০) বিপর্যয়েও মানবিকতা – নিত্যপ্রিয় ঘোষ – আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ১৯৯০

৩১) চিরন্তন মাতৃত্বের সঞ্জীবনী ঃ অলকানন্দার পুত্রকন্যা – তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – সিনে অ্যাডভান্স, ০৪.০৫.১৯৯০

৩২) বিপর্যয়েও মানবিকতা – নিত্যপ্রিয় ঘোষ – আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ১৯৯০

৩৩) কিছু লোক কিছু নাটক – মনোজ মিত্র – বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ পৃ. ১৪

৩৪) পুটিরামায়ণ – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৩০৯

৩৫) ঐ, পৃ.৩০৭

৩৬) সুন্দরম্-এর শোভাযাত্রা ঃ ব্যক্তি থেকে সমষ্টি চেতনার নাটক – রানা দাস – ওভারল্যান্ড, ২৬ মার্চ ১৯৯৩

৩৭) ঐ

৩৮) শূন্য রথে বসে আছি ঃ শোভাযাত্রা – সমরেশ মজুমদার – দেশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

৩৯) সুন্দরমের 'শোভাযাত্রা' – নৃপেন্দ্র সাহা – গণশক্তি – ১১.০২.১৯৯২

৪০) শোভাযাত্রা – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২,পৃ. পৃ.২৫

৪১) সুন্দরমের 'শোভাযাত্রা' ঃ সীমা জয়ের নাটক – রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় – পশ্চিমবঙ্গ – ২৫বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ৩১.০১.১৯৯২

৪২) তৃণমূল স্তরের নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব' – নির্মল ধর – প্রতিদিন, ১৫.০১.১৯৯৫

৪৩) আখ্যানবয়নের বৈশিষ্ট্যে অন্য মাত্রা – স্বপন মজুমদার

৪৪) বিষয়ে অভিনব, অভিনয়েও দুর্দান্ত – দিব্যেন্দু পালিত – আনন্দবাজার, ২৭.০৫.১৯৯৪

৪৫) রঙের হাট – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.১৩০

৪৬) উটপাখি – সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৪৭) ছায়ার প্রাসাদ – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১১২

৪৮) মনোজ মিত্রের অসামান্য অভিনয় – মনসিজ মজুমদার – আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জুলাই ১৯৯৯

৪৯) পালিয়ে বেড়ায় – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৭৫

৫০) নাকছাবিটা – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৭

৫১) ঐ, পৃ.৪২

৫২) কুহুযামিনী – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৬৩

৫৩) ঐ, পৃ.৬৭

৫৪) ঐ, পৃ.৭৫

৫৫) ব্রিজের ওপর বাপি – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.২১৫

৫৬) যা নেই ভারতে – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.১৯

৫৭) ঐ, পৃ.৪১

৫৮) যা নেই ভারতে – দীপেন্দু চক্রবর্তী – দেশ

৫৯) জয়বাবা হনুনাথ – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৩৭৭

৬০) ঐ, পৃ.৩৮২